রম্যকথা

আনিসুল হক

একটি রম্যকথা

রোমাঞ্চ রম্যকথা

নিবেদন রম্যকথা

শিবলু

লিমন

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

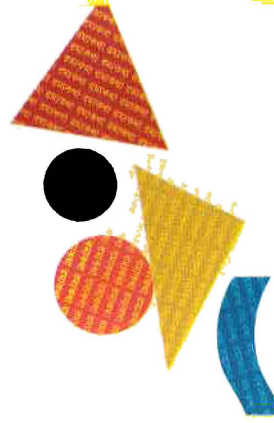

আনিসুল হকের গদ্যকার্টুন, রম্যরচনা আর রম্যগল্পের সংকলন একটি। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, এই সময়ের সবচেয়ে পরিশীলিত বিদ্রূপের নাম গদ্যকার্টুন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেছেন, রম্যতা আনিসুল হকের প্রাণের জিনিস। এই গ্রন্থ একই সঙ্গে হাসাবে, ভাবাবে এবং বিষণ্ন করে তুলবে। ভালো রম্যরচনার সেইটাই বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থ একই সঙ্গে সচল বাংলাদেশের একটি সময়ের স্থির প্রতিচ্ছবিও।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

রম্য কথা

রম্য কথা

আনিসুল হক

পার্ল পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN-984-70162-0002-1

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক
প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ইলা কম্পিউটারর্স

মূল্য ১৪০.০০ টাকা

RAMMYA KATHA By Anisul Haque, Published By Hassan Zaidi,
Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication February 2008 Price 140 Tk. only
E-mail pearl_publications@yahoo.com
Website www.allaboutbangladesh.com

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২, ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

উ ৎ স র্গ

সুমন্ত আসলাম প্রীতিভাজনেষু
লেখালেখি যার গভীর ভালোবাসার নাম

ভূ মি কা

মোটামুটিভাবে গত এক বছরে প্রকাশিত গদ্যকার্টুন, রম্যরচনা, রম্যগল্প এই বইয়ে একসঙ্গে থাকল। এগুলো আসলে সময়ের প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ কথিত স্ফুলিঙ্গের মতো, স্ফুলিঙ্গ পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল এই তার আনন্দ।

এখন প্রিয় পাঠকদের ভালো লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

জানুয়ারি ২০০৮ **আনিসুল হক**

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস :

ফাজিল
তিনি এবং একটি মেয়ে
৫১বর্তী
একাকী একটি মেয়ে
জিম্মি
সুচরিতাসু
যতদূর থাক ফের দেখা হবে
বেকারত্বের দিনগুলিতে প্রেম
খেয়া

গদ্য-কার্টুন :

সরস কথা নিরস কথা
রম্য অরম্য
ধরা
কৌতুকের ছলে বলে যাই
অহেতুক কৌতুক
সেই গাধা সেই পানি
মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ
অশ্বডিম্ব
গাধা
ছাগলতন্ত্র

কয়েক টুকরো আমেরিকা

নিউইয়র্কের জন এফ কে বিমানবন্দর। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ক্লান্তিকর উড়াল শেষে আমরা অবতরণ করেছি। সস্ত্রীক ড. আনিসুজ্জামান, রাবেয়া খাতুন, মাহমুদুজ্জামান বাবু, তারিক সুজাত আর দলবলসহ কুদ্দুস বয়াতি। এর পরের কাজ, ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়াতে হবে। মার্কিন পাসপোর্টধারীরা একটা দরজা দিয়ে চলে যাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্যও আছে বিশেষ কাউন্টার। বাকিরা দাঁড়াবে ইমিগ্রেশনের লাইনে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা মধুর বিস্ময়। আবৃত্তিশিল্পী মিথুন আহমেদ কাজ করেন এমিরেটসে। তিনি বিমানের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। বললেন, আপনারা ভিআইপি, আমার সঙ্গে আসুন। ইমিগ্রেশন লাইনের সামনে তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আমরা সবাই আমাদের আমন্ত্রণপত্রগুলো বের করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। ইমিগ্রেশনের কাউন্টারে যে আমেরিকান অফিসাররা থাকেন, তাঁদের কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ হিসপ্যানিক, কেউ বা পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত। এখানে এসে সবাই আমেরিকান। তাঁদের একেকজনের উচ্চারণ একেক রকম। এরা যে প্রশ্ন করে, সেটা যে সব সময় বোঝা যাবে, তা না-ও হতে পারে। সহজ উপায় হলো, হাতের আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে দেওয়া। নে বাবা, এখন যা বোঝার বুঝে নে।

মাহমুদুজ্জামান বাবু কুদ্দুস বয়াতিকে বললেন, কুদ্দুস ভাই, আপনার ইনভাইটেশন লেটার কই?

কুদ্দুস বললেন, ওইটা তো সাথে নাই, লাগেজে।

ইমিগ্রেশন পার না হওয়া পর্যন্ত লাগেজ পাওয়া যাবে না। এখন কুদ্দুস বয়াতি ইমিগ্রেশন পার হবেন কী করে!

আমি এই সব সময়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নিয়ম মেনে চলি। নিজের কাগজ নিয়ে সবার আগে একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। দারাপুত্র পরিবার, আমি কার কে আমার, আমি জানি না।

কিন্তু শিল্পী মাহমুদুজ্জামান বাবু আবার মানবপ্রেমিক কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। তিনি কুদ্দুস বয়াতিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাগজ ছাড়া বয়াতি ইমিগ্রেশনের এই ভবনদী পেরোবেন কী করে!

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও দেখা যাচ্ছে, মাহমুদুজ্জামান বাবুর উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর। তিনি বললেন, কুদ্দুস ভাই, আপনাকে যা-ই জিজ্ঞাসা করবে, বলবেন, নো ইংলিশ।

আমরা সবাই ইমিগ্রেশন পার হয়ে গেলাম। আনিসুজ্জামান স্যার ও তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন সবার আগে। আমার আর বাবু ভাইয়ের সুবিধা হলো, আমরা গত দুই বছরে দুবার ঢুকেছি আমেরিকায়। ফলে ওদের কম্পিউটারে রেকর্ড আছে। আঙুলের ছাপ মেশিনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো রেকর্ড কম্পিউটারে ওঠে, শুধু জিজ্ঞেস করে, এর আগে কবে এসেছিলে। বললে মিলিয়ে মাথা নাড়ে আর ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। কাজেই আমরাও পেরিয়ে গেলাম। তারিক সুজাত এইবার প্রথমবারের মতো প্রবেশপ্রার্থী। তাঁকে অন্য ঘরে যেতে হলো, সেপ্টেম্বর ১১-এর পরে রেজিস্ট্রেশন করে তারপর ঢোকার নিয়ম চালু হয়েছে।

আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। যথারীতি আয়োজকদের পক্ষ থেকে মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা অনুপস্থিত, এই বিমানবন্দরের কাছেই এসে গেছেন, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎরেখার মতো মুখজোড়া হাসি নিয়ে হাজির হবেন একটু পরে, দাদা, পথে কষ্ট হয়নি তো। আমাদের বন্ধু মঞ্জুরুল ইসলাম এসে গেছেন ফুল নিয়ে, রাবেয়া খাতুনের সম্মানে চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরা।

কিন্তু কুদ্দুস বয়াতি কই?

তাঁকে সপারিষদ আটকানো হয়েছে।

আমরা যখন ইমিগ্রেশন পার হয়ে পেছনের দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন দেখতে পেয়েছিলাম, কুদ্দুস বয়াতিকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে যাওয়ার সময় কুদ্দুস বয়াতি আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মতোই হাত নেড়েছিলেন।

এখন কুদ্দুস বয়াতিকে রেখে আমরা নড়তেও পারছি না।

তারিক সুজাতও বেরিয়ে এলেন একটু পরে।

কিন্তু কুদ্দুসের কী হবে!

তারও খানিকক্ষণ পরে কুদ্দুস বয়াতিও বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ও কুদ্দুস ভাই, কী হলো?

কুদ্দুস বয়াতি জবাব দিলেন, নো ইংলিশ।

ইমিগ্রেশনের কাউন্টারে নো ইংলিশ শুনে তাঁকে ভেতরে আলাদা ঘরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রশ্ন যা-ই হোক না কেন, কুদ্দুস উত্তর দিয়েছেন, নো ইংলিশ।

মাহমুদুজ্জামান বাবুর এই বুদ্ধিতে ফল হয়েছে। কুদ্দুস বয়াতিকে সপারিষদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কমেডি না ট্র্যাজেডি

আমাদের দলে সবচেয়ে তরুণ কে? আনিসুজ্জামান স্যার। এই বয়সেও তিনি আমাদের আগে হাঁটেন, আমাদের চেয়েও বড় রসিকতা করেন, এবং শারীরিক ধকলও নিতে পারেন। আনিসুজ্জামান স্যার উঠেছিলেন ফাহিম রেজা নূরদের বাসায়। তারিক সুজাত আর মাহমুদুজ্জামান বাবু এক বাসায়। আমি উঠেছি যথাপূর্বং মঞ্জু-সীমাদের ওখানে।

মঞ্জুরুল ইসলাম আমাদের বন্ধু, সাংবাদিক, প্রাক্তন সহকর্মী আর এখন নিউইয়র্ক এটিএন বাংলার কর্ণধার। (কর্ণধার শব্দের আসল মানে আমি জানি না, আমার ধারণা, যিনি কান ধরে থাকেন। মঞ্জুরুল ইসলাম এটিএন বাংলা নিউইয়র্কের কান না ধরলেও হাল যে ধরেছেন তাতে আমার সন্দেহ নেই)

মঞ্জুর নেতৃত্বে আমরা যাব আটলান্টিক সিটিতে। নিউইয়র্ক শহর থেকে ঘণ্টা চারেক গাড়ি চালিয়ে যেতে হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে ওই শহরটি প্রধানত জুয়াড়িদের আকর্ষণ করার জন্য তৈরি। কিন্তু আমাদের মতো ডাল-ভাত টাইপ বাঙালিরাও ওই শহরে যেতে পারে, নানা ধরনের থিমেটিক হোটেল দেখার জন্য। একেকটা হোটেল একেক থিমের ওপরে বানানো, কোনোটার থিম তাজমহল, কোনোটার থিম মিসরীয় সভ্যতা। সে এক চোখ-ধাঁধানো এলাহি কাণ্ড ।

আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত বেশি হয়ে যাবে। রাতে থাকব ওখানে। পরের দিন আবার রওনা হবো সকাল সকাল। এই ধকল কি সইতে চাইবেন আনিসুজ্জামান স্যার। স্যার, থাকবেন, নাকি আমাদের সঙ্গে যাবেন? স্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজি। যাবেন। এর আগেও স্যার গিয়েছিলেন আটলান্টিক সিটিতে, বঙ্গ সম্মেলনে।

একই গাড়িতে বড় মানুষদের পাশাপাশি পেলে আমি একটু সবক নিয়ে নিতে চাই। আমি পড়াশোনা করেছি বুয়েট থেকে, ওখানে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সভ্যতা নিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনি। বই পড়ে নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করি। কাজেই প্রায় কিছুই বুঝি না, আর যা বুঝি, ভুল বুঝি। বড় মানুষকে কাছে পেলে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস

করে তাঁর মতটা জেনে নেওয়া যায়। যেমন: গাড়িতে বাজছে মৌসুমী ভৌমিকের গান। একটু পরেই অ্যালেন গিন্সবার্গের 'সেপ্টেম্বর অন দি যশোর রোড' বাজতে লাগল। স্যারকে বললাম, স্যার, ধরেন এই গানটা। কবিতা হিসেবে এটার খুব ভালো বলে গণ্য হওয়ার কথা না, কারণ গানটা উপদেশমূলক। 'কাকে বলি আজ মৃত্যু থামাও' বলে এর একটা উপসংহারও দেওয়া আছে। কবিতার ক্ষেত্রে শব্দকেই যাঁরা মনে করেন লক্ষ্য, যেমন মালার্মে, তাঁদের দলের কবিতায় এই উপদেশ থাকার কথা নয়। কিন্তু এই যে আমেরিকার এক কবি কবে এটা লিখেছিলেন, সেই একাত্তরে, আজ ৩৬ বছর পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার মানুষ সেটা অনুবাদ করে গাইছে, আর আমরা সেটা কী আকুল হয়ে শুনছি, এটার কি কোনো মূল্য নেই?

স্যার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এটা মূল্যবান।

যা-ই হোক, যে গল্প বলার জন্য এই প্রসঙ্গ এল, তা হলো ক্লান্তিকর ভ্রমণ; রাতজাগা ইত্যাদি সত্ত্বেও দেখতে পেলাম, আনিসুজ্জামান স্যারই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তপোক্ত আছেন।

নিউইয়র্কে মুক্তধারার অনুষ্ঠান হচ্ছে দুটো হলে। একটা হলে আলোচনা, যেখানে দর্শকসংখ্যা খুবই কম। আরেকটা হলে সংগীতায়োজন, গান গাইবেন হাবিব, সেটার প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। ওই বড় মঞ্চেই গবেষক-লেখক গোলাম মুরশিদের সংবর্ধনা। হাসান ফেরদৌস, আনিস স্যার, গোলাম মুরশিদ প্রমুখের সঙ্গে আমিও উঠেছি।

দাঁড়িয়েই সংবর্ধনা বচন পঠিত হলো, পর্দায় ভিডিও ছবিও দেখানো হলো গোলাম মুরশিদ সাহেবের ওপরে। তাঁকে সম্মাননা হিসেবে উত্তরীয় পরানো হলো। কৃত্য শেষে বাতি নিবিয়ে দেওয়া হলো। প্রায় অন্ধকারের মধ্যে আমরা মঞ্চ থেকে নেপথ্যে চলে আসছি। হঠাৎই মেঝেতে রাখা ইয়া বড় একটা স্পিকারে পা বেধে পড়ে গেলেন আনিসুজ্জামান স্যার।

আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। স্যারের হাত-পা কিছু ভাঙল নাকি! স্যারের স্মৃতিশক্তি, মনের জোর, চলাফেরার শক্তি একজন তরুণের পক্ষেও ঈর্ষণীয়, কিন্তু বয়স তো আসলে মনের বন্ধন মানবে না।

স্যারের কাছে দৌড়ে গেলাম। স্যার মোটামুটি একটা ডিগবাজি খেয়েছেন। পায়ের খানিকটা কেটে গেছে, রক্তও বেরোচ্ছে।

তিনি উঠলেন কারও সাহায্য ছাড়াই। এবং বলতে লাগলেন, 'আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক আছি।'

তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মিলনায়তনের বাইরে আসছি। তিনি বললেন, 'ট্র্যাজেডি আর কমেডির পার্থক্য জানো?'

স্যার!

'শোনো, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইন্টারভিউ নিচ্ছেন মুজিবুর রহমানের (বেতারশিল্পী, পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক)। জিজ্ঞেস করলেন, ট্র্যাজেডি আর কমেডির পার্থক্য কী?

মুজিবুর রহমান বললেন, ধরা যাক, আমি মধুর ক্যান্টিন থেকে আসছি। কলার খোসা পায়ের নিচে পড়ল, আর আমি পিছলে পড়ে গেলাম। তাহলে এটা কমেডি।

আর আমার জায়গায় যদি আপনি পড়তেন, তাহলে সেটা হতো ট্র্যাজেডি।

কারণ এটা হচ্ছে মহতের পতন।

আনিসুজ্জামান স্যারের মনের জোর আর রসবোধের পরিচয় আবারও পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম।

যাক, স্যারের এই পা হড়কে পড়ে যাওয়াটা মহতের পতন হলেও শেষতক ট্র্যাজেডি বলে গণ্য করতে হলো না। এটাকে আমরা কমেডি হিসেবেই নিতে পারলাম। কারণ স্যার ভেঙেও পড়েননি, হাত-পাও ভাঙেননি। **রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আর পাদ্রি সাহেবের সেমিনার** মুক্তধারার এই বাংলা উৎসবের প্রধান ঘটনা ছিল সেমিনার। কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিল সংগীতায়োজন।

আগেই যেমনটা বলেছি, সেমিনারে শ্রোতাসমাগম হতো খুব কম। কিন্তু তাতে সেমিনারের গুরুত্ব বা গৌরব কোনোটাই কমেছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। ঢাকা থেকে যাওয়া প্রকাশকেরা ফরিদ আহমেদ, মনিরুল হক আর আহমেদ মাহমুদুল হক, তারিক সুজাত, মাহমুদুজ্জামান বাবুসহ আমরা বসে পড়লাম দর্শকসারিতে, কখনো বা মঞ্চে। কথা বলছেন হয়তো সমরেশ মজুমদার, সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান, প্রশ্ন করছেন জ্যোতির্ময় দত্ত, তাঁর পাশেই হাসান ফেরদৌস আর রাবেয়া খাতুন, তর্ক জমে উঠলে মুখ খুলছেন গোলাম মুরশিদ। আর বইমেলার নামে সবকিছু হলেও বইমেলার অংশটাই ছিল সবচেয়ে নিষ্প্রভ। কারণ প্রকাশকেরা ঢাকা থেকে মাস দুয়েক আগে জাহাজে করে অনেক অনেক বই চালান করেছিলেন, সেসব নিউইয়র্ক সমুদ্রবন্দরে পড়ে ছিল, ছাড়ানো যায়নি। এই নিয়ে প্রকাশকেরা অনেকটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন।

হয়তো আমার সঙ্গে যাওয়া মঞ্জুরুল ইসলাম বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে ফাহিম রেজা নূর বা প্রথম আলো বন্ধুসভার কর্মীরাও দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি ও দর্শকমানকে উন্নততর করেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের মন ভরে না। সেমিনারে দর্শকসংখ্যা কম থাকবে কেন?

তখন আনিসুজ্জামান স্যার আমাদের সান্ত্বনা দিলেন একটা ঘটনা বলে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বক্তৃতা দেবেন। সভাপতি একজন পাদ্রি। নির্দিষ্ট সময়ে দুজনেই অনুষ্ঠানস্থলে হাজির। কিন্তু শ্রোতা বলতে একটা কাকপক্ষীও নেই। সভাপতি

বললেন, হবে হবে। শ্রোতা আসবে। কেউই আসে না। বৃষ্টি শুরু হলো। কিছু মানুষ এসে ঢুকল ওই ভবনে। এবার শ্রোতা হবে। তাও হয় না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিলিয়ার্ড খেলা হচ্ছে, বৃষ্টিতাড়িত আশ্রয়প্রার্থীরা সবাই খেলা দেখছে। তখন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বললেন, সেমিনার বাতিল করে দিন।

সভাপতি বললেন, না, হবে। আপনি বক্তৃতা আরম্ভ করুন। বক্তা বক্তৃতা করলেন। সভাপতি হাততালি দিলেন। তারপর সভাপতির ভাষণ শেষ হলে বক্তা হাততালি দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠান শেষ করলেন।

সবচেয়ে দামি ক্রিম

মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক উপস্থিত ঢাকার প্রকাশকদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। অন্তত গাত্রবর্ণের দিক থেকে তাঁর উজ্জ্বলতা ফরিদ আহমেদ কিংবা মনিরুল হকের চেয়ে বেশি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে একটা জিনিসের অভাব খুবই বোধ করতে লাগলেন। তা হলো, মুখে মাখার ক্রিম। একটা ক্রিম কেনা দরকার, বারবার জানাচ্ছিলেন তিনি।

এই সমস্যার সমাধান হলো লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে। একটা বড় মল বা সুপারমার্কেটে গেছি আমরা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্যোগী সমাজসেবক ধরনের মানুষ বাচ্চু ভাই আমাদের এই মলে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা যে যার মতো করে কেনাকাটা করছি। সবার কেনাকাটা শেষ হলো। আবার গাড়িতে উঠতে হবে। শুধু মাহমুদুল হকের কেনাকাটা শেষ হয় না। কারণ তিনি মুখে মাখার ক্রিম কিনছেন। একটা হারবাল প্রসাধনীর দোকানে তিনি অনেক খুঁজে পেতে একটা ক্রিম পেয়েছেন। সেটার দাম দেওয়ার জন্য তাঁকে লম্বা কিউর পেছনে দাঁড়াতে হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে তিনি কাউন্টারে পৌঁছালেন। দাম কত?

৯০ ডলার।

আহমেদ মাহমুদুল হক হাসবেন, না কাঁদবেন—বুঝতে পারছেন না। হিসাব কষে দেখা গেল, ক্রিমের দাম পড়ছে ছয় হাজার টাকারও বেশি। ঢাকায় এটা ২০০ টাকায় সারা যেত। এতক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর দামের ভয়ে চলে আসাটাও শোভন নয়।

অগত্যা বিরস বদনে তিনি দাম পরিশোধ করলেন। সময় প্রকাশনীর ফরিদ আহমেদ কৌতুকপ্রিয় মানুষ। তিনি সারাক্ষণ লেগে রইলেন মাহমুদুল হকের পেছনে। মাহমুদ, আপনাকে তো আরও ফরসা দেখা যাচ্ছে।

সেই মহা মূল্যবান ক্রিমের টিউবটি সবার দর্শনীয় ও আলোচ্যবস্তুতে পরিণত হলো।

কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্ক ফেরার পরে সেটা কেবল আলোচ্যই রইল, দ্রষ্টব্য রইল না।

কারণ ফেরার পথে মাহমুদ সাহেব মূল্যবান ক্রিমটা হাতের ব্যাগে রেখেছিলেন। নিষ্ঠুর আমেরিকান পুলিশ সেটা এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার আগে বাজেয়াপ্ত করেছে।

তখন ফরিদ আহমেদের নেতৃত্বে শুরু হলো মাহমুদুল হককে সান্ত্বনা দেওয়ার পালা। বারবার করে সবাই বলতে লাগলেন, আহা মাহমুদ, এত দামি ক্রিমটা ওরা কেড়ে নিল। ফেলে দিল!

ঐশ্বরিঁয়া রাই প্রসঙ্গ

নিউইয়র্কে একবার এসেছিলেন ঐশ্বরিয়া রাই। বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানের আয়োজকদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সংগৃহীত অর্থ দান করা হবে বাংলাদেশের পথশিশুদের জন্য। ঐশ্বরিয়া রাইও বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার সময় অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন, 'শিশুদের জন্য একটা কিছু করতে চাই।'

নিউইয়র্কে ঐশ্বরিয়ার একজন আত্মীয় থাকেন। তাঁকে ধরলেন উদ্যোক্তারা। শিশুদের জন্য চ্যারিটি প্রোগ্রাম। ঐশ্বরিয়া বললেন, আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না, শুধু যাতায়াত আর হোটেলভাড়া। যথেষ্ট। আমি আসব।

ঐশ্বরিয়াকে বলা হলো, আপনি টিকিট করে ফেলুন। আমরা এখানে শোর টিকিট বিক্রি করছি। আপনি এলে আপনাকে টাকা পরিশোধ করা হবে।

আমাদের তারিক সুজাতের এক আত্মীয় আছে নিউইয়র্কে। অঞ্জন। পড়াশোনা করেছে ফটোগ্রাফি নিয়ে, নিউইয়র্কে। সে-ই এই গল্প করেছে। গাড়িতে যখন সে এই সব গল্প করত, হাসতে হাসতে সিট থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হতো আমাদের।

অঞ্জনকে প্রধান উদ্যোক্তা, ধরা যাক, তাঁর নাম মি. ক, বললেন, অঞ্জন, তোমার ওপরে দায়িত্ব ঐশ্বরিয়াকে রিসিভ করা। তাঁর টেক কেয়ার করা।

অঞ্জন দুটো লিমোজিন ভাড়া করে এয়ারপোর্টে গেল। ঐশ্বরিয়া রাই আর তাঁর মা এসেছেন। ঐশ্বরিয়া হাত বাড়িয়ে দিলেন, মাই নেম ইজ ঐশ্বরিয়া। অঞ্জন তো মুগ্ধ। ঐশ্বরিয়ার মা-ও তাকে অঞ্জন বেটা অঞ্জন বেটা বলে ডাকতে লাগলেন।

লিমোজিনে করে তাঁদের হোটেলে আনা হলো। কিন্তু ভাড়া দেবে কে? মিস্টার ক বললেন, অঞ্জন, তুমি তোমার ক্রেডিট কার্ড থেকে দিয়ে দাও। আমরা পরে তোমাকে শোধ করে দেব।

হোটেলের বুকিং ফি, সিকিউরিটি ডিপোজিট–সবই অঞ্জন দিচ্ছে তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। তরুণ ছেলে একটা, প্রায় বেকার।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। শোর টিকিট বিক্রি হয় না। খুব দামি হল ভাড়া নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিউইয়র্কের বাঙালি কেউই বিশ্বাস করছে না যে ঐশ্বরিয়া রাই এসেছেন। কারণ দই ভেবে চুন খেয়ে তারা অনেকবার মুখ পুড়িয়েছে।

ঐশ্বরিয়ার ভাই বলে দিলেন, দিদি কিন্তু হল হাউসফুল না হলে মঞ্চে উঠবেন না। তখন আমাদের দেশে যেভাবে ভোটপ্রার্থীরা বাসে করে ভোটকেন্দ্রে ভোটার নিয়ে যান, তেমনি করে জ্যাকসন হাইটস থেকে বাসে করে বাঙালি দর্শকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো।

এদিকে অঞ্জনের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। এরই মধ্যে তার ক্রেডিট কার্ড থেকে ১৮ হাজার ডলার চলে গেছে। কিন্তু টিকিট তো বিক্রি হয়নি। এই টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো আশা নেই।

সে তখন ফোন করল ব্যাংকে। বলল, সাত দিন আগে আমার ক্রেডিট কার্ড হারিয়ে গেছে। ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের সব লেনদেন বন্ধ করে দিল।

ঐশ্বরিয়া মঞ্চে উঠবেন। কঠিন সিকিউরিটি। অনেক টাকা দিয়ে দামি সিকিউরিটি ফোর্স ভাড়া করা হয়েছে। তাদের প্রধানের সঙ্গে অঞ্জনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, অঞ্জন যাকে যাকে অ্যালাউ করবে, কেবল সে সে মঞ্চে উঠতে পারবে।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। এবার প্রধান উদ্যোক্তার মঞ্চে ওঠার পালা। সিকিউরিটি তাঁকে আটকে দিল। মি. ক বললেন, আমি অনুষ্ঠানের আয়োজক। আমি উঠব না মঞ্চে?

অঞ্জনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই লোক কি উঠবে মঞ্চে?

নো। অঞ্জন জানিয়ে দিল।

তখন সিকিউরিটির লোকেরা মি. ক-কে পাঁজাকোলা করে ধরে হলের বাইরে রেখে এল।

ঐশ্বরিয়া রাই আর তাঁর মা হোটেল থেকে বিদায় নেবেন। ওরা বলল, আপনাদের চেক আউট তো হয়নি। সব টাকা বাকি। ক্রেডিট কার্ড রিফিউজড হয়েছে।

বিশ্বসুন্দরী রাগে কাঁপতে লাগলেন। মাকে বললেন, মা, তুমি দিয়ে দাও তো।

পরে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের মালিক ছুটে এসে বিল শোধ করলেন। তারপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। চারদিক থেকে হাজার হাজার ডলারের পাওনাদারেরা ছুটে আসছে।

আমি বাংলার গান গাই

আমেরিকায় এবারের বাংলা উৎসবে সবচেয়ে জমেছিল হাবিবের কনসার্টগুলো। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হাবিব বলতে পাগল। নিউইয়র্কে হাবিব যখন 'ভালোবাসব বাসব রে বন্ধু' গানটা গাইতে আরম্ভ করল, পুরো হলের দর্শকেরা মোবাইল ফোনে আলো জ্বেলে দুই হাত মাথার ওপরে তুলে দোলাতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তার পরেও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে লস অ্যাঞ্জেলেসের অনুষ্ঠানের একটা মুহূর্ত। মাহমুদুজ্জামান বাবু গান গাইছেন। তাঁর নিজের লেখা গান, লালনের গান। শেষে ধরলেন 'আমি বাংলার গান গাই'। কোত্থেকে একজন এসে মাহমুদুজ্জামান বাবুর গায়ে জড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের একটা বড় পতাকা। পুরো মিলনায়তন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর কী মায়াভরা এই গানটা: 'আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ'। বাবু গান করছেন, দর্শকদের চোখে পানি। এই প্রবাসীরা আমেরিকায় আছেন বটে, কিন্তু তাদের মন পড়ে আছে সাত সাগরের ওপারের নিভৃত এক দেশ বাংলায়। তাদের টানছে সেই ফেলে আসা শৈশব, স্কুল-কলেজের বন্ধুদের মুখ, বাবা-মা-ভাইবোন-আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি।

গান শেষ হলো। মহিলাদের কান্না আর থামছে না। পপকর্ন দিয়ে গাঁথা একটা মালা নিয়ে মঞ্চে উঠেছে একটা শিশু। সেই মালা সে পরিয়ে দিল বাবুকে।

১১ অক্টোবর ২০০৭

সৌরভকাহিনী

আমাদের বন্ধু গীতিকার সৌরভ শমসেরের কাহিনী আপনাদের বলব কি বলব না, এটা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে দ্বিধান্বিত আছি। সৌরভের কাহিনীর অনেকটাই গৌরবের, তবে সবটা নয়। গৌরবেরটুকুন বলি। সৌরভ খুব সুন্দর মিল দিয়ে কথা বলতে পারে। আমি হয়তো বললাম, আমার নাম আনিস?

সে বলবে, আমার নাম কি জানিস?

আমি হয়তো বললাম, হ্যালো। সে বলল, হেলতে হেলতে জীবন চলে গেল।

এমনিতে তার সেন্স অব হিউমারও খুব ভালো। *দুখাই* নামের একটা ছবি দেখে সে বলল, ছবির নামের বানান ভুল হয়েছে। দ-এর জায়গায় গ হবে।

ইয়াজউদ্দিনকে নিয়ে তার অমরবাণী, হায় হাসান, তুমি নাই, আছে ইয়াজুদ।

সৌরভ শমসেরের নাম গীতিকার হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পরে তার কতগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

সৌরভ মদ্যপান করতে লাগল।

আমি বলি, এই বেটা তুই মদ খাস কেন?

সে বলল:

যে খায় মদ না,

সে এক বদনা।

আমি বললাম:

যে খায় মদ, সে এক বদ।

সে বলল, যে খায় মদ্য, সে লেখে পদ্য। পদ্য লেখার জন্যে মদ্যপান করা অতীব জরুরি।

আমি বললাম, জরুরির সঙ্গে তো কোনো কিছুর ছন্দ মিলল না। আমি মেলাই।

মদ খাওয়া জরুরি,

এই কথা মনে হয় গরুরই।

সে আমার দিকে রোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর বলল, আমি মদ খাই না।

কথাটা সে মিথ্যা বলে নাই। সে মদ খায় না। মদই আসলে তাকে খায়।

সে বলে, মদ কেন খাই? পয়লা নম্বরের মিল পাই।

মদ না খেলে নাকি তার মাথা খোলে না। তার উক্তি, ক্রিয়েটিভিটির গোড়ায় জল ঢালতে হয়।

তা যদি কেউ সৃষ্টিশীলতার গোড়ায় নিজের পয়সা দিয়ে কিনে জল ঢালে, আমার কী বলার আছে।

তবে কথা হচ্ছে, সে যে সব সময় নিজের পয়সায় মদ খায় তাও না। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়, ভূতে জোগায়।

তো সৌরভ মদ্যপান করে। কিন্তু মাতাল হয় না। এই কথা তার এক বন্ধু তাকে বলেছিল। সে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল, কে বলেছে আমি মাতাল হই না। অবশ্যই হই।

সে তার মাতলামোর প্রমাণ হিসেবে নিউ মার্কেটের সামনের রাস্তায় ভর সন্ধ্যাবেলা জলবিয়োগ করতে লাগল। তার মুখে অভয়মন্ত্র: দ্যাখ শালা, আমি মাতাল হয়েছি কি না, কে এমন হিসু করে মাতাল বিনা।

মাতাল হিসেবে সৌরভ শমসেরের খ্যাতি অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

তখন তার মদের টাকা আর ভূতে জোগায় না। তাকেই জোগাড় করতে হয়।

সে চমৎকার সব কৌশল অবলম্বন করল। একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিবিএর ফার্স্টবয়কে নিয়ে এল আমার সামনে। আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, ওর বাবা মারা গেছে। লাশ নিয়ে যেতে হবে দেশের বাড়িতে। দুই হাজার টাকা লাগে। এক হাজার জোগাড় হয়েছে। আর এক হাজার কি তোমার কাছে হবে?

আমি বললাম, আমারও বাবা মারা গেছে। আপনি কি আমাকে ওই এক হাজার টাকা আপাতত দিতে পারেন? সৌরভ কেটে পড়ল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই দু-তিনজনকে পাওয়া গেল যারা জানালেন তারা সৌরভের সমাজসেবাব্রতে সাহায্য করেছেন। বিবিএর ফার্স্টবয়ের মৃত বাবার লাশ প্রেরণের জন্যে চাঁদা দিয়েছেন।

একদিন শুনি শেরাটন হোটেলের মোড়ে সৌরভকে পুলিশ একপায়ে খাড়া করে রেখেছে। কারণ কী। গভীর রাত। সৌরভ ওই পথ দিয়ে বেবিট্যাক্সিযোগে যাচ্ছে। পথের ধারে প্রহরারত পুলিশকে দেখে সে স্কুটার থামাতে বলল। পুলিশকে বলল, এই তোরা এখানে কী করিস? মাছি মারিস?

পুলিশ বলল, এই এনারে বাড়ি পৌঁছায়া দাও।

স্কুটার বাংলামটর পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে এল। সৌরভই স্কুটারওয়ালাকে ফের যেতে বলেছে শেরাটনের মোড়ে। পুলিশকে তার একই প্রশ্ন: এই তোরা কী করছিস? মাছি মারছিস?

একবার দুইবার তিনবার। তিনবার স্কুটার ঘুরে এল। এবং অপার কৌতূহলী সৌরভের একই প্রশ্ন পুলিশের উদ্দেশে ধাবিত হলো: এই তোরা কী করিস। মাছি মারিস।

পুলিশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা সৌরভকে নামিয়ে একটা লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিল। তারও ঘণ্টাখানেক পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তার পাকস্থলী ওয়াশ করাল। সে বড় কষ্টকর প্রক্রিয়া। শোনা যায়, একবার কারও পাকস্থলী ওয়াশ করানো হলে সে আর দ্বিতীয়বার মদ্যপান করে না। কিন্তু সৌরভের কাছে এসব জাগতিক দুঃখকষ্ট অতি তুচ্ছ। সে বলল, বেটারা আমাকে বেঁধে রেখেছে রাখুক। কিন্তু এত দামি মদ কেন ওরা বের করে নিল।

ফিরিয়ে দাও আমার আট পেগ হুইস্কি! এই ছিল সৌরভ শমসেরের সংলাপ।

আমি আমার বউয়ের চুড়ি চুরি করে এনে বিক্রি করে এই মদের টাকা জোগাড় করেছি।

কয়েকদিন পরে শোনা গেল, সৌরভের বউ, রানীভাবি মারা গেছে। পরে জানা গেল, আসলে যায় নাই। প্রথমে তার অসুখ ও পরে মৃত্যুর কাহিনী ছড়িয়ে দিয়ে সৌরভ মদের টাকা জোগাড় করেছে।

একদিন রাতের বেলা, সে রাত দুটো হবে, হঠাৎ আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে মেজাজ খারাপ হয়। আমারও তাই হলো। মোবাইল ফোনে নাম উঠেছে কালাম মজনুর। কালাম মজনু খুব বড় গায়ক। আমাদের বন্ধু।

আমি ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, কী ব্যাপার কালাম। এত রাতে। কোনো বিপদ-আপদ!

কালাম বলল, বিপদের ওপরে বিপদ। রাতের বেলা গানের রেকর্ডিং সেরে বের হইছি। ট্যাক্সির খোঁজে হাঁটতেছি। দেখি ফুটপাতে বসে আছে এক লোক। কাছে গিয়া দেখি সৌরভ শমসের। বেহেড মাতাল। তাকে ধরাধরি করে একটা স্কুটারে তুলছি। স্কুটারওয়ালা দেখি সৌরভকে চিনে। দেখেই বলে আমি কোনো মাতালকে তুলি না। শেষে তুলল।

মগবাজারে সৌরভের বাড়ি এইটা আমি জানি। মগবাজার গাবতলা। স্কুটার নিয়া আসছি এইখানে। এখন সৌরভ নিজের বাড়ি চিনতেছে না। আমি কই, ও সৌরভ, তোমার বাড়ি কোনটা? সে খালি খুঁজে। বলে, চিনতেছি না। কী করি বলো তো। সৌরভ নিজের বাড়ি চিনতেছে না। তুমি সৌরভের বাড়ির নাম্বার জানো।

আমি বললাম, তোমার তো বাড়ি চেনার দরকার নাই। ওরে স্কুটার থেকে নামায়া দিয়া ওই স্কুটার নিয়া তুমি চলে যাও বাসায়। সব মাতালই জাতে মাতাল তালে ঠিক।

সৌরভের বউ এসে নানাজনের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল, সৌরভ রাতে-বিরেতে ফিরে বউ পেটায়। বাড়িওয়ালা তাদেরকে নোটিশ দিয়েছে। তারা তাকে বাড়িভাড়া দেবে না।

কী আর করা। আমরা সবাই চাঁদা দিয়ে সৌরভকে একটা মাদকমুক্তি ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিলাম। ডাক্তার বলেছেন, অন্তত তিন মাস এখানেই থাকতে হবে।

রানীভাবি বলেন, দুর্নাম হবে না? গীতিকার মানুষ। আমরা বললাম, দুর্নাম যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ও যদি সেরে ওঠে, তাতেই ওর সুনাম হবে। আমাদের কালচারাল ফিল্ডে মাদক একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুনামহানির ভয় পেলে চলবে না। রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করায়া প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে ট্রিটমেন্ট করানো ছাড়া উপায় নাই। নাইলে এরা খালি নিজেরা নষ্ট হবে না, নিজের পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের কষ্ট দেবে না, এরা পুরা দেশটাকে ছারখার করে ফেলবে।

ওর বউ বলল, ঠিক আছে। ভর্তি থাকুক। ওর ছেলে বা মেয়ে এসে যেন দেখে বাবা ঠিক আছে।

আমি বললাম, কবে এক্সপেক্ট করছেন।

দেরি আছে। কেবল পাঁচ মাস চলছে।

বলতে বলতে রানীভাবি কাঁদতে শুরু করলেন। সন্তানসম্ভবা একজন মহিলা এইভাবে কাঁদছেন। দেখে নিজের চোখই ভিজে আসতে লাগল। কোনো মানে হয়!

২৫ ডিসেম্বর ২০০৬

অটোগ্রাফের সন্ধানে এক বিকেল

আজকাল দাওয়াত-আতঙ্কে ভুগি। নিজের তাগিদে যেতে হয় কত অনুষ্ঠানে, আবার নিজেকেই মেজবান হতে হয় কখনো কখনো। আমন্ত্রণপত্র দেখলেই গায়ে জ্বর আসে। আজ আমি কোথাও যাব না–এ রকম একটা শুক্রবার আর কখনো কি আসবে না আর, এই পৃথিবীতে!

কিন্তু আজকের শুক্রবারটা অন্য রকম। সকাল থেকেই মনটা আনন্দে নেচে উঠতে চাইছে। আজকে একটা অনুষ্ঠান আছে, *প্রথম আলোরই* অনুষ্ঠান, যেখানে যাব বলে সকাল থেকে মনের মধ্যে সাজ-সাজ রব।

গ্রামীণফোন-প্রথম আলো বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার দেওয়া হবে আজ। শেরাটনে, বিকেলে। আমার মেয়ে পদ্যরও উৎসাহ প্রচুর, কিন্তু আমার চেয়েও বেশি কি! মেয়ের হাতে একটা ডায়েরি তুলে দিলাম, রাগী গলায় বললাম, 'রাখ এটা, অটোগ্রাফ নিবি না! পরে এসে তো কান্দবি।' রাগটা কৃত্রিম। পাছে মেয়ে বুঝে ফেলে বাবা নিজেই অটোগ্রাফ নিতে চাইছে।

৫টায় অনুষ্ঠান। পৌনে ৫টায় বান্দা হাজির। শেরাটনের গেটে, মেটাল ডিটেক্টর তোরণের অভ্যর্থনা পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল ওই যে মাশরাফি। স্বয়ং। না, মাদাম তুসো মিউজিয়ামের মোমের পুতুল নয়। লন্ডনে আমি আর পদ্য রোনালদো-পেলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি। এইখানে অরিজিনাল মাশরাফি বিন মুর্তজা। দ্য গ্রেট। পদ্য পদ্য, মাশরাফি। নে নে। আমার মেয়ে তার বাবার স্বভাব পেয়েছে, মুখচোরা। কাজেই বাবাকে তাঁর চরিত্র বদলাতে হয়, ভাই মাশরাফি, কেমন আছেন, একটা অটোগ্রাফ দেন না! এই ছেলে গত বছর ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছে পৃথিবী নামের এই গ্রহে! অথচ তাঁর হাঁটুতে অপারেশন হয়েছে তিনবার। রোনালদোর সঙ্গে অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে মিল। মাশরাফির সঙ্গে খাতির দেওয়ার জন্য বলি, চিনছেন তো আমাকে, ওই যে মজিদ, কচি খন্দকার, নড়াইলের! মাশরাফি চিনতে পারে। নিজেকে ধন্য লাগে। আমার পরিচিত মাশরাফির পরিচিত। তাহার দুটি পালন

করা ভেড়া, যখন ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া, কোলের পরে নেই তাহারে তুলে। আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।

এনামুল হক জুনিয়র আসেন। মাশরাফিকে ডাকেন, হাই ম্যাশ। পদ্য আমার কনুইয়ে চিমটি দেয়। তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আমরা ভেতরে যাই।

বলরুমের সামনে এরই মধ্যে ক্রীড়াবিদদের হাট বসে গেছে। চাঁদের হাট। ওই যে জাভেদ ওমর। ওই যে পাইলট। এই পাইলট! কত দিনের চেনা ভেবে ডাক দিই। দিয়ে লজ্জা পাই। আজ থেকে দশ বছর ধরে আমরা পাইলটকে চিনি। উনি কেন আমাকে চিনবেন! পাইলট বিনয়ী। বলেন, আমি তো আপনাকে চিনি। পাইলট ২০০৪ সালের সেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তিনি একটা বাক্য বলে আমার চোখে পানি এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আইসিসি ট্রফির একটা নকআউটের খেলায় দলের বিপদের মুখে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, আমার প্রিয় কাউকে তুমি তুলে নাও, তবু আজকের খেলায় আমাদের জয় দাও। দেশের জন্য এ ধরনের স্যাক্রিফাইস করতে চাওয়া কি যা-তা কথা!

হেই আশরাফুল! আমি একজন একজন করে খেলোয়াড় দেখি আর এগিয়ে যাই। পদ্য তার স্বাক্ষরের খাতা এগিয়ে দেয়। হাবিবুল বাশার সদালাপী, হাস্যময়। পড়াশোনা করেন। গল্প-উপন্যাসও পড়েন বোধ হয়। তার সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় আছে। তার দিকে এগিয়ে যেতে ভূমিকা লাগে না। তিনি এসেছেন সস্ত্রীক। একটু পরে সস্ত্রীক আসেন শাহরিয়ার নাফীস।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাচ্ছে। উৎপল শুভ্র মাইক্রোফোনে। আমার টেনশন হচ্ছে। কে হবেন সেরা ক্রীড়াবিদ। আমি তো শাহরিয়ার নাফীস ছাড়া কাউকে দেখি না। আজীবন সম্মাননা পেলেন রণজিৎ দাস। সেরা উদীয়মান ক্রীড়াবিদ হলেন সাকিব। ছেলেটা তো দেখতেও দেবশিশুর মতো। সেরা নারী ক্রীড়াবিদ হলেন রংপুরের মেয়ে জুঁই। সেই সুবাদে আমরা জানতে পারলাম এই দেশে মেয়েদের খেলাধুলা করাটা দিন-দিন সহজ না হয়ে কঠিন হয়ে পড়ছে। জানতে পারলাম, পঞ্চাশ দশকের নামী অ্যাথলেট জিনাত হোসেনের বক্তৃতা থেকে। সবচেয়ে ঋদ্ধ হলাম অ্যাথলেটিকস কোচ কিতাব আলী আর এসএ গেমসে ১১০ মিটার হার্ডলসে সোনাজয়ী মিঠুর বক্তৃতায়। মিঠু হলেন বর্ষসেরা রানারআপ। বললেন, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় কমানোর জন্য কত দীর্ঘ সাধনার দরকার হয়। সময় যে মূল্যবান, এই অমূল্য কথাটা যা হোক জানা গেল আরেকবার। বর্ষসেরা রানারআপ আরেকজন হলেন মাশরাফি। আমি এই ছেলের দারুণ ভক্ত। আমি মনে করি, আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশের পার্থক্য দুজন, হোয়াটমোর আর মাশরাফি।

তায়কোয়ান্দো নামের খেলাটা কী, সেটাও জানতে পারলাম এই খেলায় এসএ গেমসে সোনাজয়ী মিজানের কথায়। আর তাঁদের সরল অভিযোগ, তাঁদের কথা কেন কেউ তেমন করে লেখে না!

সবশেষে সেই টানটান উত্তেজনার ক্ষণ। কে হচ্ছেন বছরের সেরা? শাহরিয়ার নাফীস না হলে কি প্রতিবাদ জানাব? মেঘমল্লার নামে এক কিশোর তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমিও কি যোগ দেব? না। শাহরিয়ার নাফীসই হলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলো ডেভ হোয়াটমোরের ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে।

কিন্তু কেউ আর নড়ে না। চা-চক্রে জমে উঠল আড্ডা। ওই তো ফুটবলার আসলাম ভাই। ওই তো লিপু ভাই। ফুটবলার সালাউদ্দিন ভাই কি চলে গেলেন। ডানা আপা, ভালো আছেন? লিনু? *ঘরে যত মহিলারা ঘুরে ফিরে চলে, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কথা মনে মনে বলে।* আমি চোখ বড় বড় করে এদের দেখছি। ছোটবেলায় গোলকিপার শান্টুর জয়গান শুনে স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে গোলকিপার হব। আমরা অবশ্য বলতাম গোলকি। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ব্যাটসম্যানের সামনে ক্যাচিং পজিশনে দাঁড়িয়ে একদিন পিঠে ব্যাটের বাড়ি খেয়েছিলাম। ভাগ্যিস সমানতলটা লেগেছিল, ব্যথা পাইনি। কিন্তু খেলোয়াড়দের জন্য ভালোবাসাটা কমেনি একটুও। বরং দিন-দিন বাড়ছে। আদেখলার মতো করে এই তারার মেলা দেখছি। শো-বিজ তারকাদের সঙ্গে তো নানা অনুষ্ঠানে সারাক্ষণই দেখা হয়। ওদের দেখে আর নিজের ভেতরের শিশুটি জেগে ওঠে না। খেলোয়াড়দের দেখলে মনে হয় ফ্যান বনে যাই। নিজের ভারাক্রান্ত বর্তমান ভুলে চলে যাই শৈশবের দিনগুলোয়। সেইটা খুব স্বাস্থ্যকর আর অমূল্য বলে মনে হচ্ছে।

আবার কবে এই অনুষ্ঠানটা হবে? আবার কবে যাব?

আসিফকে দেখে মায়া লাগল। হায় রে কমনওয়েলথজয়ী শ্যূটার। পুলিশ তোমাকে মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে। কেন বাবা পুলিশের ড্রাইভারের সঙ্গে গণ্ডগোল করতে গেলে! ওই তো টেংকু ভাই, ক্রীড়া আলোকচিত্রী। পুলিশ তো চট্টগ্রামে তাঁকেও মেরেছিল। গত বছরের সেরা পারফরমার তো পুলিশই। শুভ্র এই কথাটা বলতে ভুলে গেল!

ভুলে গেলেই ভালো। যেমন এখন এই অনুষ্ঠানে থেকে ভুলে যাচ্ছি, বাইরে জরুরি অবস্থা! আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো সব স্থগিত হয়ে আছে!

২১ জানুয়ারি ২০০৭

কবি ও ক্যামেরা

নির্মলেন্দু গুণ আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন। অভিনয় করতে হয়েছে তাঁকে। অবশ্য এইবারও কবি নির্মলেন্দু গুণ হিসেবেই। বাংলাভিশনে মে দিবসে তাঁর তিনটা কবিতার দৃশ্যায়ন প্রচার করা হয়। *নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ* ছিল অনুষ্ঠানটির নাম। নেকাব্বরের মৃত্যুদৃশ্যটি চিত্রায়িত হয় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্যটিতে কবি নিজেই আবির্ভূত হন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেন নেকাব্বরের পড়ে থাকা দেহটিকে। এ ছাড়া, 'চাষাভুষার জন্য তুমি লিখতে আমায় কহ যে, চাষাভুষার কাব্য লেখা যায় কি এত সহজে'–এই পঙ্‌ক্তিগুলো যখন আবৃত্তি হয়, তখন ক্যামেরার সামনে কবি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

আপাতত মনে হতে পারে, এ এমন কী কঠিন কাজ? লাইট জ্বলবে। ক্যামেরা চলবে। পরিচালক বলবেন, অ্যাকশন। মোট কথা, কবিকে এক ধরনের অভিনয়ই করতে হয়েছে।

নির্মলেন্দু গুণ অভিনয় করতে রাজি হলেন?

বাংলালিংকের বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করতে রাজি করাতে কিন্তু বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ মঞ্চনাটক করতেন, বালিকা রানু হতো নায়িকা, তিনি নায়ক, নজরুল ইসলাম তো সিনেমাও করেছেন। আর আমাদের সময়ের কবিরা ইদানীং টেলিভিশন নাটকের দিকে বেশ ঝুঁকেছেন দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ভাষার একজন প্রধান সাহিত্যিক ও কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এরই মধ্যে অভিনয় করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন পরিচালিত চমৎকার টিভি-নাটক *শেখ আবদুর রহমানের* আত্মীয় *জীবনীতে*, কেন্দ্রীয় চরিত্রে। তিনি এরপর উৎসাহিত হয়েছেন নিজেই টিভি-নাটক পরিচালনা করতে। আর তরুণ কবিদের মধ্যে উৎকৃষ্টগণ–কামরুজ্জামান কামু, টোকন ঠাকুর ও মারজুক রাসেল অভিনয় তো করেছেনই, নাটকের পরিচালক হিসেবেও প্রথম দুজন নাম লিখিয়েছেন। কবি রিফাত

চৌধুরী আর সরকার মাসুদকে তরুণ বলা যাবে কি না জানি না, ওঁরাও অভিনয় করছেন টিভি-নাটকে।

প্রথমে বাংলালিংকের ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বানানো বিজ্ঞাপনে নির্মলেন্দু গুণের অংশ নেওয়ার গল্পটা বলে নিই।

রাত ১২টার দিকে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ফোন এল আমার মোবাইলে। "একটা কবিতা পাইছি, শোনেন। 'কল্পনা করুন ভাষাহীন একটা পৃথিবী, সব বই যেখানে শোকে সাদা, পিতার কাছে টাকা চেয়ে যেখানে চিঠি লেখে না পুত্র..." ইত্যাদি। পুরোটা পড়ে শুনিয়ে সরয়ারের প্রশ্ন, 'কেমন হইছে?' আমি বলি, ভালো। সরয়ার বলে, 'ঘুমের মধ্যে পাইছি আইডিয়াটা। মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন করব।' হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি হবেন এই অ্যাডের পারফেক্ট মডেল, কারণ আপনার দৃষ্টি ব্লাঙ্ক। আপনি যখন কথা বলেন, অন্য কথা ভাবেন।'

আমি জানি, সরয়ারের কথা সত্য। আমি যার সামনে বসে আছি, আসলে তার সামনে বসে থাকি না। দূরে কোথায় দূরে, আমার মন বেড়ায় ঘুরে। কিন্তু বললাম, মিয়া ফাজলামো পাইছ, এই অ্যাডের শেষে ভাষাসৈনিকদের শ্রদ্ধা জানানোর কাজটা কেবল একজন লেখক হিসেবে করে দিতে পারি। তাও করব কি না, ভেবে দেখতে হবে। এর আগে অমুক অভিনেত্রীর অ্যাডের অফার নিয়া যেই ক্যামেরা বাসার সামনে আসছে, পালায়া গেছি। অত সোজা না।

সরয়ার লাফিয়ে উঠল। 'এইটা তো আপনি ভালো বলছেন। ভাষাসৈনিকদের শুভেচ্ছা তো দিতে পারে কলমসৈনিকেরা। দাঁড়ান দাঁড়ান।'

আমি সরয়ারের এই স্বভাবের সঙ্গে খুবই পরিচিত। আমরা বহু নাটকের আইডিয়া এইভাবে কথা বলতে বলতে বের করেছি। এইটাই সরয়ারের কাজের ধরন।

বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে পরের দিন রাত ১১টায় সরয়ার জানাল, একজন কবি হিসেবে তারা চায় নির্মলেন্দু গুণকে, লেখক হিসেবে আমাকে। গুণদাকে টাকা দিতে হবে ভালো অঙ্কের, এটা আমি সরয়ারকে বলে-কয়ে নিলাম। সরয়ার বলল, এই নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কারণ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সম্মান জানানো ও সম্মানী দেওয়া, দুটোকেই সে কর্তব্য বলে মনে করে।

এইবার আমার পালা নির্মলেন্দু গুণকে রাজি করানো। সরয়ারের হয়ে এই জাতীয় কাজ অতীতে অনেক করেছি। সরয়ার প্রত্যেকবার আমাকে ফোন করে আর বলে, 'এইটা আপনাকে আমার শেষ রিকোয়েস্ট। এরপর আর কোনো রিকোয়েস্ট আমি করব না।' ওর শেষ আর শেষ হয় না।

আমি ফোন করলাম নির্মলেন্দু গুণকে, 'দাদা, আপনি কই?'

'শাহবাগে, পরীবাগের রাস্তায়।'

'আমি আসতেছি। আপনি থাকেন।'

বললাম বটে আসতেছি, কিন্তু যাই কী করে। রাত সাড়ে ১১টা। জরুরি অবস্থাচ্ছন্ন ঢাকার রাস্তা সন্ধ্যার পরই ফাঁকা হয়ে যায়। ড্রাইভার বিদায় নিয়েছে আগেই। আমি নিজেই কম্পিত হস্তে গাড়ি চালাতে চালাতে পরীবাগের রাস্তায় চলে এসে দেখি, সপারিষদ কবি দাঁড়িয়ে সোডিয়াম আলোয় ভিজছেন। তাঁকে বললাম, 'বাসায় যাবেন তো, গাড়িতে ওঠেন।'

তিনি আমার পাশের আসনে বসলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, কী বললে গুণদাকে রাজি করানো সহজ হবে। সম্প্রতি সরয়ার ওই মোবাইল কোম্পানির একটা বিজ্ঞাপন বানিয়েছে, অসাধারণ, মুক্তিযোদ্ধা আজম খান আর আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে। 'একাত্তরে তাঁর বন্দুক বেজেছিল গিটারের মতো আর গিটার বেজেছিল বন্দুকের মতো...গুরু তোমায় সালাম।' *ধনধান্যপুষ্পভরা* গানটা যখন বাজে, আবেগে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে।

বললাম, 'গুণদা, আপনি আজম খান আর আইয়ুব বাচ্চুর স্বাধীনতার অ্যাডটা দেখছেন?'

'দেখছি।'

'কেমন লাগছে?'

'ভালো না।'

ভড়কে গিয়ে বললাম, 'কেন?'

'বাচ্চু বলে, গুরু তোমায় সালাম, আর আজম খান মাথা নাড়ে। এইভাবে সালাম নেয় কেউ ক্যামেরার সামনে? তবে লাইনটা ভালো, বন্দুক বেজেছিল গিটারের মতো...।'

মুশকিল হলো তো! এই লাইনে তো রাজি করানো যাবে না।

তখন বললাম, 'আচ্ছা, একটা বিজ্ঞাপনে ধরেন কবি হিসেবে আপনাকে একটু অ্যাপিয়ার করতে হবে।'

'না না, আমি এইসব করব না। শোনো, আমি কবি হিসেবে বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছি। আর জনপ্রিয় হওয়া উচিত হবে না। অসুবিধা আছে।'

আমি বললাম, 'দাদা, সুবিধা আছে। এই বিজ্ঞাপন ফেব্রুয়ারির পরে আর দেখাবে না। লোকে ভুলে যাবে।'

'না, তাইলেও আমি করতে চাই না।'

আমি বললাম, 'দাদা, আপনি টাকা পাবেন।'

'আমার টাকার দরকার নাই।'

আমি বিস্মিত। *প্রথম আলোতে* যখনই আমার লেখা দরকার হয়, আমি প্রথমে দাদাকে বলি, 'দাদা, টাকা রেডি, পাঠায়া দিচ্ছি, একটা লেখা দিয়েন।' উনি লেখা দেন। এখন এই ওষুধেও কাজ হচ্ছে না!

আমি ভাবলাম টাকার অঙ্ক শুনলে দাদা নরম হবেন। বললাম, 'দাদা, আপনি লাখ টাকা পাবেন।'

তিনি আমাকে অধিকতর বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'এত টাকা দিয়া আমি কী করব? আমার তো টাকার দরকার নাই।'

আজিমপুরে দাদার বাসার কাছে এসে গেছি। গুণদা এখনো রাজি হননি। শেষ চেষ্টায় আমি বললাম, 'দাদা, আপনাকে আর আমাকে কাজটা কী করতে হবে আগে শোনেন। শহীদ মিনারে গিয়া ফুল দিতে হবে। আর কিছু না।'

এইবার গুণদা নরম হলেন। বললেন, 'শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া? এইটা করা যায়। আচ্ছা আমি ভাবি।'

আমি পরের দিন আবার গেলাম নির্মলেন্দু গুণের বাসায়। দাদার স্বভাব দেখি পাল্টায় নাই। সেই যে কবিতা, *অমীমাংসিত রমণী* বইয়ে 'ভাড়াবাড়ির গল্প' নামের কবিতায় নিজের বাসার বর্ণনা দিয়েছিলেন, "মৃত্যু আর জীবনের মাঝের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু এগুলেই আজিমপুরের পুরোনো কবর, কিনু গোয়ালার গলি, গ্রীন লেন।' 'না আসছে আলো না আসছে হাওয়া। শুধু টিনের চাল থেকে চুয়ে পড়া বৃষ্টির জল অবিরল ধারায় নেমেছে, কোনোদিন ফাঁকি দেয়নি'।" আজও সেই রকম বাসাতেই তিনি থাকেন। একটা টানা টিনে ছাওয়া ইটের বাড়ি। তারই দুটো রুমে তাঁর বসত। ডোরবেল নাই। বাইরের টিনের গেটে ধাক্কা দিতেই সামনের বাড়িওয়ালা বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আর কত দিন ধাক্কাধাক্কি করবেন, আমাদের অসুবিধা হয়, একটা কলিংবেল লাগায়া নেন।'

ঘরের ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঘরে কোনো আসবাব নাই বললেই চলে। আমরা ছাত্রাবস্থায় মেসে বা হোস্টেলে যে রকম কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখতাম এখানে-ওখানে, তেমনি কিছু পাঞ্জাবি ঝুলছে। স্টিলের আলমারির ওপরে তাঁর বইগুলো। একটা কম্পিউটার অবশ্য ঘরে আছে। সেই ঘর, ঘরের বাইরের পরিবেশ দেখে আমার চোখে জল চলে এল। এই লোক বলে কিনা টাকা দিয়া 'আমি কী করব! আমার টাকার দরকার নাই!'

একটা লোক এমনি এমনি বড় হয় না। কবির ভেতরে একজন ঋষি বাস করে। তাই তিনি বড় কবি। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। কবি নির্মলেন্দু গুণ কবিতার জন্য নিজের জীবনের লোভ-লালসা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'আমার সামান্য জীবনে দু দুটো অসামান্য জিনিসের সঙ্গে আমি রসিকতা

করেছি: এর একটি হচ্ছে নারী, একটি হচ্ছে টাকা। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমারও উচিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যদি এ কাজটা না করি, তো করবে কে? গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন বিষয় নিয়ে রসিকতা করা কি গুরুত্বপূর্ণ কবিকে মানায়?' (চরিত্রদোষ)

আমরা শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার কাজটা এক সকালবেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলাম। এক সন্ধ্যায় যেতে হলো সংলাপের ডাবিং করতে, স্টুডিওতে। নিজের চেহারা দেখে গুণদা খুবই চিন্তিত, 'আহা, চুলটা ঠিকমতো আঁচড়ানো হয়নি।' সরয়ার হাসতে হাসতে খুন, বলে, 'প্রত্যেকটা মডেল এসেই প্রথমে এই ডায়ালগটা বলে। গুণদা বড় মডেল...'

বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে লাগল। বইমেলাতেই বিজ্ঞাপনী সংস্থার লোক এসে চেকসমেত খাম দিয়ে গেল। গুণদার হাতে সেটা অর্পণ করা হলো।

পরের দিন সকাল সাড়ে নটার দিকে গুণদার ফোন, 'এই শোনো, ইনকাম ট্যাক্স অফিসটা কোথায়? আমি সেগুনবাগিচায়।' আমি বললাম, 'আপনি ঠিক জায়গাতেই গেছেন। ওইখানেই।' উনি বললেন, 'ইনকাম ট্যাক্সটা দিয়ে দিব, বুঝছ? তাহলে আমাদের বড়লোকেরা যে ইনকাম ট্যাক্স দিতে চায় না, তাদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত হবে...।'

শ্রদ্ধায় আবার আমার মাথা নত হয়ে এল।

এই যে নির্মলেন্দু গুণ, তিনি বাংলাভিশনের জন্যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা অভিনয় করলেন? ব্যাপার কী?

গুণদা বললেন, 'কাওনাইন সৌরভ ছেলেটা কবিতা বোঝে। ও গত বছর আমার হুলিয়াটার ওপরে একটা ভিডিও ফিল্ম করেছিল, সেটা ভালো হয়েছিল। এই জন্যে এইবার করলাম।'

'আপনি তো আগেও নাটক করেছেন। ষাটের দশকে, যখন মামুনুর রশীদের সঙ্গে থাকতেন?'

'পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেলে মামুনুর রশীদের সঙ্গে থাকতাম। তখন ওখানেই একটা নাটক লিখেছিলাম, *এ যুগের আকবর* নামে। মঞ্চনাটক। মামুনুর রশীদেরই আইডিয়া। উনিই পরিচালক। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বলে রেডিও ও টিভির টেকনোলজিটা ওই নাটকে ব্যবহার করা হয়েছিল। মোনেম খানের স্টাইলে সম্রাট আকবর রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিয়েছিল আর সেটা ওই ক্যাম্পাসে প্রচারিত হয়েছিল।'

'আর আপনি যে অভিনয় করেছিলেন টিভি-নাটকে সেইটা বলেন

'টিভির জন্যে আমি একটা নাটক লিখেছিলাম–আপন *দলের মানুষ* নামে। মোমিনুল হক ছিলেন পরিচালক। ওই নাটকটা প্রচারিত হয়েছিল '৭১ সালের

জানুয়ারিতে। নাটকে ঢাকার রাজপথের মিছিল দেখানো হয়। ওই নাটকে আমি নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।'

'তখন আপনার দাড়ি ছিল?'

'অল্প অল্প।'

'তো আপনার অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন কেমন?'

'৫০০ টাকা পেয়েছিলাম। আড়াই শ লেখার জন্যে, আড়াই শ অভিনয়ের জন্যে। এ ছাড়া আলমগীর কবীর *এক্সপ্রেস* নামের পত্রিকায় সমালোচনা লিখেছিলেন, হি অ্যাকটেড ওয়েল হোয়েন হি কেপ্ট হিজ মাউথ শাট। বুঝো, সংলাপ ছাড়া অভিব্যক্তি ভালো দেওয়া কিন্তু বড় অভিনেতার কাজ, তাই না? হা হা হা।'

'আর সংলাপ বলার সময়?'

'তখনো আমার উচ্চারণে ময়মনসিংহের টান ছিল তো।'

'আর আপনার নাটক করার কথা শুনে কবি-সাহিত্যিকেরা কী বললেন?'

'সমকাল সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর বললেন, আর কোনো দিন যেন তোমাকে অভিনয়ের আশে-পাশে না দেখি...'

'আপনার নায়িকা কে ছিলেন?'

'ডলি আনোয়ার।'

'নায়িকা তো ভালোই পাইছিলেন। *সূর্য দীঘল বাড়িতে* অভিনয়ের জন্য তাঁকে চিরদিন মনে রাখা হবে।'

ডলি আনোয়ার আর নাই। আলমগীর কবীর নাই। সিকান্দার আবু জাফর নাই। নির্মলেন্দু গুণ রয়ে গেছেন।

নেকাব্বরের লাশ শুয়ে আছে কমলাপুরে। 'নেকাব্বর শুয়ে আছে জীবনের শেষ ইস্টিশনে। তার পচা বাসী শব ঘিরে আছে সাংবাদিক দল। কেউ বলে অনাহারে, কেউ বলে অপুষ্টিতে, কেউ বলে বার্ধক্যজনিত ব্যাধি,– নেকাব্বর কিছুই বলে না।' এই কবিতার দৃশ্যায়নে তিনি হাজিরা দেন ক্যামেরার সামনে। কিংবা নেপথ্যে বাজছে তাঁরই কবিতা:

'চাষাভুষার জন্য তুমি লিখতে আমায় কহ যে
চাষাভুষার কাব্য লেখা যায় কি এত সহজে?
সবাই যারে পথের ধারে গেছে দুপায়ে দলে,
তুমি কি চাও নাম কুড়াতে তাদের কথা বলে?
তাদের সেই ঘাম জড়ানো নাম কুড়াতে হলে
পুড়তে হবে মাঠের রোদে, ভিজতে হবে জলে।'

আর ক্যামেরার সামনে রবীন্দ্রনাথের মতো শ্মশ্রু ও গুম্ফশোভিত নির্মলেন্দু গুণ উদাসভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকান, তখন কি তাঁর মনে বাজে তাঁর নিজের লেখা কবিতা–আকাশ যেমন বিমানের চেয়ে বড়, তেমনি আমার বেদনা বক্ষ থেকে।

১০ মে ২০০৭

আবার কৌতুকের ছলে বলে যাই

ভাগ্যিস, এই জরুরি অবস্থা জনগণমনধন্য। গণমাধ্যম-বান্ধব। নইলে সত্যি সত্যি যদি মত প্রকাশের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো, তাহলে হয় কারাগারে যেতে হতো, নইলে লিখতে হতো লাল শাকের উপকারিতা, কাঁচা পায়খানার স্বাস্থ্যঝুঁকি, পৌষ-সকালে শীতের পিঠা নিয়ে। এই সরকারের নীতিনির্ধারকদের ধন্যবাদ যে, এক দিনের মধ্যেই তারা কারফিউ ও গণমাধ্যমের ওপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন।

এই সুযোগে কতগুলো কৌতুক বলে নিই। নতুন কৌতুক পাচ্ছি না। পুরোনো দিয়েই চালাই।

একদিন এক লোক কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বালির নিচে একটা প্রদীপের মতো কী দেখল। সেটা হাতে নিয়ে বালি পরিষ্কার করবার জন্যে যেই না সে ঘষা দিয়েছে, অমনি বেরিয়ে এল সেই বিখ্যাত রূপকথার আলাউদ্দিনের দৈত্য। বলল, আপনার একটা ইচ্ছা আমি পূরণ করব। আপনি বলেন, আপনি কী চান?

লোকটি বলল, এই যে সমুদ্র, এইটার ওপরে একটা ব্রিজ বানিয়ে দাও, আমেরিকা পর্যন্ত।

দৈত্য বলল, স্যার, আপনি বেশি চাচ্ছেন। এর আগে আন্তঃমহাদেশীয় সেতু তো পৃথিবীতে হয় নাই। মহাসাগরের ওপরে সেতু। এইটা কি সম্ভব? কত ইঞ্জিনিয়ার, কত মিস্ত্রি, কত লোহা লাগবে, ইয়ত্তা আছে? তার ওপর এটা আদৌ ফিজিবল কি না, সেটাও তো দেখতে হবে। আপনি অন্য আরেকটা আদেশ দেন।

লোকটা বলল, আচ্ছা, তাহলে একটা কাজ করো, আমেরিকা তো পৃথিবীর ঠিক উল্টো পিঠে। বাংলাদেশ থেকে একটা ফুটা করে তা আমেরিকাতে বার করো। সেই ফুটায় ট্রেন লাগায়া দাও। সরাসরি আমেরিকাতে চলে যাব।

দৈত্য বলল, এইটাও প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব কি না, আমি ঠিক শিওর না। পৃথিবীটা এফোঁড়-ওফোঁড় করতে হলে পৃথিবীর মধ্যখানে গনগনে আগুনের স্তর পার

হতে পারে। সেটার ভেতর দিয়ে ট্রেন চলবে কিনা...আপনি বরং আরেকটা আদেশ করেন।

লোকটা বলল, বাংলাদেশে এমন একটা নির্বাচন করো, যেটা সুষ্ঠু হয়েছে বলে উভয় জোটই মেনে নেবে, যেটাতে থাকবে না পেশিশক্তি ও দুর্নীতিবাজদের সামান্যতম প্রভাব...

লোকটা তালিকা দীর্ঘ করতে চেয়েছিল। দৈত্য তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, তালিকা আর দীর্ঘ করতে হবে না। উভয় জোটকে খুশি করার নির্বাচন করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনি বরং বলেন, আগের দুইটা ইচ্ছার কোনটা আপনি পূরণ করতে চান। আমি কাজে লেগে পড়ছি।

ফখরুদ্দীন আহমদের নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের চাওয়ার সীমা নাই। তাঁরা ভোটার-পরিচয়পত্র করবেন, নির্ভুল ভোটার তালিকা করবেন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দূর করবেন, বিদ্যুৎ দেবেন, প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিধান করবেন, তারপর যথাশিগগির সম্ভব একটা নির্বাচনও দেবেন। আর সেই নির্বাচন হবে সুষ্ঠু, সর্বজনগ্রাহ্য।

এর চেয়ে মহাসাগরের ওপরে সেতু বানানো কি সহজ নয়?

তবে, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, যতদূর সম্ভব জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে।

জঞ্জাল কারা বানিয়েছে?

আবার কৌতুক বলতে হয়। এইটাও পুরোনো কৌতুক:

ডাক্তার, প্রকৌশলী আর রাজনীতিবিদের বাহাস বসেছে। কাদের পেশা আদিতম?

ডাক্তার বলল, অবশ্যই আমারটা। কারণ, যেদিন আদমকে সৃষ্টি করা হলো, তার পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়াকে, সেদিনই তো অপারেশনের জন্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের দরকার হয়েছিল।

প্রকৌশলী বলল, তারও আগে মহাজগৎটা ছিল বিশৃঙ্খল। সেটাকে ঈশ্বর শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন। কাজেই তখনই দরকার হয়েছিল প্রকৌশল শাস্ত্রের। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের পেশাটাই আদিতম।

রাজনীতিবিদ মুচকি হেসে বললেন, কিন্তু মহাজগতে ওই বিশৃঙ্খল পরিবেশটা কে সৃষ্টি করেছিল। কাজেই রাজনীতিই পৃথিবীর আদিতম পেশা।

এই লেখাটা লেখার জন্যে আমি ইন্টারনেটে বসে বিভিন্ন জোক সাইটে ঢুঁ মেরেছি। প্রথম যে কৌতুকটা পেয়েছিলাম, সেটা হলো, বাবা আর মা ভাবছেন, তার কৈশোর-উত্তীর্ণ ছেলে বড় হলে কী হবে। আচ্ছা একটা পরীক্ষা করা যাক। ছেলে যখন ঘরে আসবে, তার আগে তারা ঘরে কিছু ডলার, একটা বাইবেল আর একটা

হুইস্কির বোতল রেখে দিলেন। ছেলে যদি ডলার নেয়, বুঝতে হবে, সে বড় হয়ে ব্যবসায়ী হবে, ছেলে যদি বাইবেল নেয় তাহলে সে ধার্মিক হবে আর যদি সে নেয় বোতলটা, তাহলে–সর্বনাশ, সে বড় হয়ে একটা বেহেড মাতালই হবে।

ছেলে ঘরে ঢুকছে। বাবা-মা আলমারির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে রইলেন।

ছেলেটা ঘরে ঢুকে সব দেখে প্রথমে মানিব্যাগে টাকা ভরল, তারপর বাইবেলটা থলেয় পুরল, তারপর বোতলটা। বোতলটা খুলে পান করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। বাবা-মা আর্তনাদ করে উঠলেন, ছেলে তো বড় হয়ে রাজনীতিবিদ হবে।

না। রাজনীতিবিদদের নিয়ে এইসব রসিকতা আর করছি না। আমি সত্য সত্য বিশ্বাস করি, সব পেশাতেই ভালো মানুষ আছে, সব পেশাতেই খারাপ মানুষ আছে। আর ভালো মানুষের সংখ্যাই এই দেশে বেশি। সব পেশাতেই। আর আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই দেশটা স্বাধীন হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন সর্বস্বত্যাগী ও সর্বোচ্চ ত্যাগে প্রস্তুত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রাজনীতিবিদের জন্যে, তাজউদ্দীন আহমদ নামের এক বিজ্ঞ ও সুবিবেচক ত্যাগী মানুষের হাল ধরে থাকার জন্যে; মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, শহীদদের আত্মত্যাগ ও সাড়ে সাত কোটি মানুষের সবার অংশগ্রহণ, ত্যাগস্বীকার ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে এক হতে পেরেছিল, তাও সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানও হতে পেরেছিল তিন জোটের রূপরেখা প্রণীত হওয়ার পরেই।

তবে সত্য বটে, হুমায়ুন কবির বা শেরেবাংলা ফজলুল হক বা মাওলানা আবুল কালাম আজাদদের মতো মেধাবী, শিক্ষিত ত্যাগী নেতার সংখ্যা দেশে কমে আসছে। কী রেখে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বা তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, নজরুল ইসলাম–মৃত্যুর আগে? কয়টা বাড়ি, কত বিঘা জমি, কত কত ব্যবসা! কিচ্ছু না। নিজেদের উন্নতির জন্যে আগে কেউ রাজনীতি করতেন না। এখন নিজেদের উন্নতির জন্যে রাজনীতি করে না, এমন মানুষই কম। তবু নিজেরা দুর্নীতি করে অর্থসম্পদ লুট করেননি, এমন নেতা এখনো এই দেশে আছেন। যেমন আছেন মতিয়া চৌধুরী। যেমন ছিলেন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। নুরুল ইসলাম নাহিদকেও সেই দলে ফেলা যাবে।

কিন্তু আজকে ছাত্রনেতা মানেই বড় গাড়ি, দামি মোবাইল ফোনসেট। যুবনেতা মানেই দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডার। এই অবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নটা বুনে চলুক।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যার লেখায় কয়েকটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা হাজার বছর ধরে বলে

আসছেন, ভেবে আসছেন, আসলে মানুষ স্বভাবতই বেপথু হয়ে যায়। সৎ প্রার্থী খুঁজে লাভ নাই, যদি সিস্টেম সৎ না হয়। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, কেউ দুর্নীতি করতে না পারে। আমরাও তা-ই মনে করি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করতে হবে।

এমাজউদ্দীন আহমদই বলেছিলেন, সাংবিধানিক পদগুলোতে, যেমন নির্বাচন কমিশন ও সরকারি কর্মকমিশনে সরকারি দল ও বিরোধী দল উভয়ের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বলেছিলেন, ডেপুটি স্পিকার নেওয়া উচিত বিরোধী দল থেকে। বিলেতের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, ওখানে স্পিকার পদে নির্বাচিত ব্যক্তি দল থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলও আর প্রার্থী দেয় না। ফলে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এই সব প্রস্তাব সম্ভবত এখনই ভেবে দেখতে হবে।

তবে সময় চলে যাবে দ্রুত। এখনই বিএনপি ও আওয়ামী লীগ একই সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। আবদুল মান্নান ভুঁইয়া আর এম এ জলিল একই ভাষায় কথা বলছেন, মওদুদ আহমদ আর তোফায়েল আহমেদ এক সুর গলায় তুলে নিয়েছেন। এঁরা দ্রুতই এক হয়ে যাবেন। এবং এঁরা যদি এক হয়ে নির্বাচন চাইতে থাকেন, তখন দেশের মানুষও রাস্তায় নেমে আসবে। কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁদের জনসম্পৃক্ততা অন্য যেকোনো গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি।

আর সবচেয়ে বড় কথা, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। সেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালনার মাধ্যমে। তার কোনো বিকল্প নাই। মনে রাখতে হবে, সংবিধানের এই মৌলিক প্রত্যয়টা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চরিতার্থ হয় না, বরং স্থগিত থাকে।

আর আমরা মাথাব্যথার চিকিৎসা হিসেবে মাথা কাটার কথা ভাবতে পারি না। রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু রাজনীতিহীনতা তার সমাধান নয়। আমরা বিরাজনীতিকরণের বিপদ এর আগে অনেক দেখেছি। আর দেখতে চাই না।

২৩ জানুয়ারি ২০০৭

ওনাদের নিয়ে কৌতুক

একটা কৌতুক বলে নিই।

সড়ক দুর্ঘটনার পর এক ব্যক্তি নিজেকে আবিষ্কার করল হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হয়েছে? আমি এখানে কেন?

ডাক্তার বললেন, এক্সিডেন্টের পর আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। আপনার জন্যে দুটো খবর আছে। একটা সুসংবাদ, আরেকটা দুঃসংবাদ। কোনটা আগে শুনতে চান?

দুঃসংবাদটাই আগে বলেন।

আপনার পা দুটো কেটে ফেলতে হয়েছে।

এবার সুসংবাদটা বলেন।

আপনার জুতা দুইটা কেনার জন্যে লোকের লাইন পড়ে গেছে। আপনি অনেক ভালো দাম পাবেন।

কৌতুকটাকে যদি একটু সুন্দর ভাষায় বলি, তাহলে এভাবে বলা যায়, পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর পাদুকাদ্বয় বিক্রি করে তিনি ভালো মূল্য পাচ্ছেন।

পদচ্যুত হওয়া সত্যি বেদনাদায়ক। কেউই তাঁর পদ হারাতে চান না। পদবিও না।

আমাদের দেশে এখন অনেকেই পদ হারাচ্ছেন। তবে তাঁদের পাদুকা ক্রয়ের জন্যে কেউ ভিড় জমিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এই দেশে পদচ্যুতের পেছনে দুধের মাছিরা ভিড় করে না।

এবার আরেকটা কৌতুক।

এক ভদ্রমহিলা। তাঁর কোলে বছর তিনেকের একটা বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করছে। তাঁরা একটা সুপার মার্কেটের চকলেটের পসরা সাজানো এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন। মহিলা বলছেন, খুকুমণি, আরেকটু, আরেকটু গেলেই আমরা চকলেটের

এলাকা পেরিয়ে যাব। ছি ছি ছি। জেদ করে না। চকলেট খেলে দাঁত নষ্ট হয়। তুমি মুটিয়ে যাবে। বাচ্চাটি আরও জোরে কাঁদল। তিনি বলেই চলেছেন, ছি ছি। ধৈর্য ধরো। এই রকম করে না। এসব বলে তিনি কাউন্টার পেরিয়ে টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই সময় একজন ভদ্রলোক তাঁকে বললেন, আপনার বাচ্চাকে আপনি বুঝি খুকুমণি বলে ডাকেন? নাকি এটাই তার নাম?

ভদ্রমহিলা বললেন, না না, খুকুমণি আমার নিজের নাম। ওর নাম কল্পনা। ব্যাপার হলো, ভদ্রমহিলা এতক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। এই বয়সে চকলেট খেয়ে তিনি আর মুটিয়ে যেতে চান না।

আমরা জানি, পাওয়ার করাপ্টস। অ্যান্ড অ্যাবসোলুট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসোলুটলি।

এই সময় ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁদের কর্তব্য হবে সারাক্ষণ নিজেকে এই বলে শক্ত রাখা, আমরা এসেছি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন করে একটা স্থায়ী উদাহরণ সৃষ্টি করে যেতে। চকলেটের প্রলোভনে নিজেদের আদর্শচ্যুত করা যাবে না।

এবার এক চালাক লোকের গল্প। এক লোক চুল কাটানোর সেলুনে ঢুকল একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে। ঢুকে নিজের চুল কাটাল, শেভ করাল, গা ম্যাসাজ করাল, শ্যাম্পু করাল, ফেসিয়াল করাল। তারপর বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বলল, তুমি বসো, আমি একটা টাই কিনে নিয়ে আসি। এই, খুব সুন্দর করে এর চুল কেটে দাও।

বাচ্চা ছেলেটার চুল কাটা হয়ে গেলে ক্ষৌরকার বলল, বাবু, তোমার বাবা কই?

উনি তো আমার বাবা না।

তাহলে?

উনি আমাকে রাস্তায় একা পেয়ে বললেন, বাবু, তুমি কি বিনা পয়সায় চুল কাটাতে চাও?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

আমি তাঁর সঙ্গে চলে এলাম।

একটা সেলুনে বিনা পয়সায় চুল কাটানোর জন্যে চালাকি করার কী দরকার আমরা বুঝি না। যেমন বুঝি না, যাঁরা কোটি কোটি টাকার টেন্ডার নাড়াচাড়া করার মালিক ছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ কেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পিক-আওয়ার বেদখল করে রেখে সেখানেও লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বেচারা নাট্যনির্মাতাদের

ঠকিয়েছিলেন। কেন মন্ত্রী-এমপির ছেলেরা ২৫ হাজার টাকার মোবাইল ফোন ছিনতাই করতে গিয়ে গুলি ছুড়েছিল।

বিএমডব্লিউ চালানো-এই ছেলেরাই, মন্ত্রীদের, এমপিদের।

তো এমনই একজন মন্ত্রীর যুবক ছেলে বিএমডব্লিউ চালাচ্ছে। আর বলছে, মাই বিএমডব্লিউ, মাই বিএমডব্লিউ। গাড়ির প্রেমে সে এত মগ্ন যে ড্রাইভিংয়ের দিকে নজরই নাই। গাড়ি একটা গাছে ধাক্কা লাগল। সে প্রাণে বেঁচে গেলেও গাড়িটা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেল। সে কাঁদতে লাগল, মাই বিএমডব্লিউ, মাই বিএমডব্লিউ।

পাশ দিয়ে আরেকজন যাচ্ছিলেন গাড়ি চালিয়ে। তিনি বললেন, ভাই, আপনার তো বাঁ হাতটা নাই। আপনি বিএমডব্লিউ-বিএমডব্লিউ বলে কাঁদছেন কেন?

কী বলেন, আমার বাঁ হাত নাই। হায় রে, আমার রোলেক্স ঘড়ি। আই হ্যাভ লস্ট মাই রোলেক্স ঘড়ি।

এরা এই রকমই। এরা নিজের শরীরের চেয়ে দামি ঘড়ি, ছড়ি, গাড়ি, বাড়িকে ভালোবাসে বেশি। কাজেই ধরা না দিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত–এই ঘোষণা দিলে কাজ হতে পারে। এদের অনেকেই অঙ্গহানিতে রাজি হবে, কিন্তু সম্পদহানিতে নয়।

হয়তো নারীকেও বেশি বেশি ভালোবাসে। এত ভালোবাসে যে তাদের অনেক গার্লফ্রেন্ড দরকার হয়। সে আরেক গল্প।

বরং একজন খাদ্যমন্ত্রীর গল্প বলি। তিনি গেছেন উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা এলাকা পরিদর্শনে। গিয়ে বললেন, কোথায় মঙ্গা। আমি তো কোনো মঙ্গা দেখি না। এক চরে গিয়ে তিনি দেখলেন, একজন লোক কাশ চিবিয়ে খাচ্ছে।

তুমি এই ঘাস খাচ্ছ কেন?

স্যার, আমার খাবার নাই।

আচ্ছা তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে ঢাকায়।

স্যার, আমার বউও স্যার খাইতে পায় না।

ও-ও কি ঘাস খায়?

জি স্যার।

ওকে নিয়ে চলো।

স্যার আমার ছয় ছেলেমেয়ে।

ওদেরও নিয়ে চলো। যদি কি না ওরা ঘাস খায়।

জি স্যার, গত সাত দিন আমরা কাইশা খায়াই আছি।

মন্ত্রী ওদের ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। চামচা বলল, স্যার, আপনার দয়ার শরীর। ভুখা একটা ফ্যামিলির দায়িত্ব নিলেন।

আরে বেটা গাধা, মন্ত্রী বললেন, আমার বাড়ির লনের ঘাসগুলো বড় হয়ে গেছে। এদের নিয়ে গেলে আর কষ্ট করে ঘাস কাটাতে হবে না।

পুনশ্চঃ শুনতে পাচ্ছি, দেশে আইন হবে–যে ফেরারি দুর্নীতিবাজ গডফাদাররা ধরা দেবেন না, তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তাহলে ওইসব প্রাসাদে কি উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীর জায়গা দেওয়া যায় না? এই মাঘের শেষে যখন ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন ওই ঘরহারা বস্তিবাসী কোথায় রাত কাটাচ্ছে, কে জানে?

৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

বই কিনব না, কিনব না, কিনব না

বই কেন কিনব? বই পড়ে কী হয়? শিল্প-সাহিত্যের কী-বা এমন ক্ষমতা?

বই কী করতে পারে? কবিতার শক্তি কতটুকুন? কী করতে পারে একটা ভালো উপন্যাস কিংবা চিত্রকলা? কী করতে পারে *ব্যালাড অব আ সোলজার* বা *ক্রেইনস আর ফ্লাইং*-এর মতো একটা ছবি? স্টেডিয়ামের উইকেট পড়া কি বন্ধ করতে পারে কবিতা? শেয়ার মার্কেটের দরপতন ঠেকাতে পারে? মহাযুদ্ধ বন্ধ করতে পারে? ইরাকের নিষ্পাপ শিশুদের ছবি আমরা দেখেছি ইন্টারনেটে, মাথাভরা স্প্লিন্টারের আঘাত নিয়ে একেকটা শিশু কী বেদনায় পৃথিবীর সমুদয় কষ্ট আর বিষাদ ধারণ করে মূক চেয়ে আছে! বই কি সেই শিশুর পাশে দাঁড়াতে পেরেছে?

না, পারেনি। তাই আমরা বই পড়ব না। বই কিনব না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার আগে বুশ সাহেবকে নিয়ে প্রচলিত পুরোনো কৌতুকটা আরেকবার বলে নিই।

স্বর্গের দরজায় একে একে যাচ্ছেন স্বর্গপ্রাপ্তরা। প্রথমে গেলেন আইনস্টাইন। স্বর্গের প্রহরী তাকে আটকে ফেলল। আপনি?

আমার নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। আমি একজন বিজ্ঞানী। পৃথিবীর জ্ঞানের জগৎকে আমি পাল্টে দিয়েছি। স্বর্গ অবশ্যই আমার প্রাপ্য।

আচ্ছা আচ্ছা। আমরা আপনার নাম জানি। আপনার স্বর্গে আসবার কথা। তবে আপনিই যে আইনস্টাইন তার কি কোনো প্রমাণ আছে? কোনো আইডি কার্ড?

না, আইডি কার্ড তো আমার নাই।

তাহলে আপনি একটা কিছু করে দেখান, যাতে আমরা বুঝতে পারি আপনিই সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আইনস্টাইন তখন একটা কাগজে লিখলেন ই ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার। তারপর স্বাক্ষর করে দিলেন। প্রহরী হেসে বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, আপনিই মহান সেই ব্যক্তি, আপনি ভেতরে প্রবেশ করুন।

এরপর এলেন পাবলো পিকাসো। তাকেও প্রহরী আটকে দিল। কারণ তাঁর কাছেও পরিচয়পত্র নাই। শেষে পিকাসো তার বিখ্যাত পায়রার ছবিটা একটানে এঁকে

নিচে স্বাক্ষর করে দিলেন। প্রহরী খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, স্যার, আপনি স্বর্গে প্রবেশ করুন। কোনোই সন্দেহ নাই যে আপনিই সেই মহান শিল্পী।

তারপর এলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। স্যার, আপনি?

আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ। আমি অবশ্যই স্বর্গে ঢুকব।

নিশ্চয়ই স্যার। কিন্তু আপনিই যে বুশ, তার কোনো প্রমাণ আছে? কোনো পরিচয়পত্র?

পরিচয়পত্র? আমিই সারা পৃথিবীর লোকদের পরিচয়পত্র দিয়ে থাকি, আমাকে কে পরিচয়পত্র দেবে! ওইসব আমার কাছে নাই।

তাহলে স্যার আপনি একটা কিছু করে দেখান, যাতে আমরা বুঝতে পারি, আপনিই সেই মহাপরাক্রমশালী বুশ।

বুশ বললেন, তোমার এত বড় স্পর্ধা। তুমি আমার কাছে পরিচয়ের প্রমাণ চাও! তুমি জানো আমি কত বড় ক্ষমতাশালী মানুষ। আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে পারি।

ও আপনি অনেকটা করে ফেলেছেন বটে। তবে প্রমাণ ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দিতে পারি না, তা আপনি যত বড় মানুষই হন না কেন! এর আগে আলবার্ট আইনস্টাইন ও পাবলো পিকাসোও তাদের পরিচয়ের প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

বিস্মিত কণ্ঠে বুশ বললেন, আইনস্টাইন, পিকাসো–এঁরা আবার কারা?

স্বর্গের প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি, আপনিই প্রেসিডেন্ট বুশ। আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন।

হ্যাঁ, জর্জ ডব্লিউ বুশ হচ্ছেন তেমনই এক ব্যক্তি, যিনি পিকাসো বা আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন কি না এ সন্দেহ নিঃসন্দেহে প্রকাশ করা যায়।

ফলে এর পক্ষেই সম্ভব গণবিধ্বংসী অস্ত্রভাণ্ডার আছে, বা তুই আমার পানি ঘোলা করছিস কেন বলে ইরাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। নির্বিচারে ক্লাস্টার বোমা ফেলা ইরাকের জনবসতিতে, বিক্ষত বিকলাঙ্গ করা অসংখ্য নিরপরাধ শিশুকে।

কিন্তু এই ব্যক্তিটিই যদি ছোটবেলা থেকে সংস্পর্শে আসতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর, স্পর্শ পেতেন সেরা সাহিত্যগুলোর, রসাস্বাদন করতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকলাগুলোর, উপভোগ করতেন পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সংগীত কিংবা চলচ্চিত্র, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে যদি তিনি একদিন অধিষ্ঠিত হতেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পদটিতে, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখতে হতো। ওই ব্যক্তিটির পক্ষে আর সম্ভব হতো না ব্যাবিলনের মতো ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংস করা, শিশুরা আছে এই রকম সম্ভাবনাপূর্ণ স্থানের আশপাশে বোমা ফেলা।

এই লেখা শুরু করেছিলাম বই কিছুই পারে না, তাই বলে। এখন বলতে চাই, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি খুব গোপনে একটা কাজ করে। মানুষের মনের ভেতরটাকে পরিচর্চা করে, পরিচর্যা করে। মানুষকে মানুষের জন্যে সংবেদী ও সমব্যথী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যেথা সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। দণ্ড দাতাও যে কাঁদতে পারেন, সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি মানুষের হৃদয়ে গোপনে সারাক্ষণ করে চলে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পের নানা মাধ্যম।

আসলে ব্যক্তিমানুষই আসল। ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। প্রতিটা ব্যক্তি যদি একটা শুভবাদী শুভ্রহৃদয় মানুষ হয়ে ওঠে, আলোকিত মানুষ হয়ে ওঠে, তাহলে এই জগৎটা আলোয় আলোয় ভরে উঠবে নাকি?

কাজেই বইয়ের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে বারবার। বই কিনতে হবে। এই দেশে অন্তত দেড় কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন আছে। তারা মাসে অন্ত ত ২০০ টাকার ফোন-কার্ড কেনে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সংযোগ আছে অন্তত ৪০ লাখ বাড়িতে। তারা মাসে অন্তত ২০০ টাকা চাঁদা দেয় ডিশ অ্যান্টেনার জন্যে! তাহলে এই দেশে হাসান আজিজুল হকের গল্পের বই, সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য, আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধের বই, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্মৃতিকথা, শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদের কবিতার বই কেন এক লাখ কপি বিক্রি হবে না?

হয় না, কারণ আমরা বই পড়ি না। আমাদের বাসে-ট্রেনে-বিমানে আমরা কাউকে বই পড়তে দেখি না। কিন্তু ইউরোপে আমেরিকায় এটা একটা সাধারণ দৃশ্য। বলা হচ্ছে বইয়ের দাম বেশি। মিথ্যা অভিযোগ নয়, তবে সৈয়দ মুজতবা আলী সেই কবে বলে গেছেন, বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা, সিনেমার টিকেটের লাইনে দাঁড়িয়ে, নাকি ফুটবল খেলার টিকেটের কিউয়ে। ৮০ টাকা দিয়ে দুই পৃষ্ঠার গ্রিটিংস কার্ড কিনতে দাম বেশি মনে হয় না, ১০০ পৃষ্ঠার বই কিনতে গেলে দাম একটু বেশি মনে হয়। কাগজের দাম সরকারকে কমাতে হবে। এই দাবি জোরে তুলে বলি, বই পড়ার অভ্যাসটাও আমাদের বাড়াতে হবে। বিয়েতে, বিয়ের বার্ষিকীতে, জন্মদিনে আগে যে বই উপহার দেওয়া হতো এই দেশে, সেই রেওয়াজ কোথায় গেল? কোথায় গেল পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগারের আন্দোলন?

এই ফেব্রুয়ারিতে বলি, আসুন, বই কিনি। বই কেনার জন্যে একটা বাজেট রাখি। ছেলেমেয়েদের হাতে বই তুলে দিই। যদি এই সভ্যতাটাকে বাঁচাতে চাই।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

ও ঢেউ খেলে রে...

ঢেউ খেলে। ঢেউ জাগে। কোথায়? নদী আর সাগরের জলে। মরুভূমির বালিসমুদ্রে। মেঘে আর বাতাসে। ঢাকাই ছবির নায়িকার তনুমনে। আল মাহমুদ লিখেছিলেন, ও পাড়ার রূপসী রোজেনা, সারা অঙ্গে ঢেউ তার তবু মেয়ে কবিতা বোঝে না। কবিতা না বুঝলেও রূপসীদের অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ বয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কোনো ঢেউই কি চিরস্থায়ী? পৃথিবীতে কি এমন কোনো ঢেউ আছে, যেটা থেকে যায়? সাগরের ঢেউ, ওটা থাকে না বলেই ঢেউ।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে অন্তত একটি ঢেউ আছে, যেটা স্থায়ী। তার নাম ঢেউটিন।

এই ঢেউটিনের ঢেউটা মোটামুটিভাবে স্থায়ী। আর ঢেউয়ের পরিমাপ প্রতিটার বেলায় অভিন্ন।

কিন্তু আপনি কি জানেন, আমরা যাকে ঢেউটিন বলি, আসলে তা টিন নয়। টিন-এজেরও নয়।

হ্যাঁ, এগুলো আসলে ঢেউ খেলানো গ্যালভানাইজড লোহা। করোগেটেড গ্যালভানাইজড আয়রন। সংক্ষেপে সিজিআই। ঢাকার ইংরেজি সংবাদপত্রে এগুলোকে বলা হয় সিআই শিট। এর সঙ্গে টিনের সম্পর্ক নেই।

এই বিষয়টা আমিও জানতাম না। কীভাবে জানলাম? সম্প্রতি টিন নামক পদার্থটির পক্ষ থেকে কে বা কারা একটা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন গদ্যকার্টুনের কাছে। তাঁরা বলছেন, টিন নামের ধাতুটির নাম আসলে স্টানাম। স্টানাম মেটালিকা, বা টিনের ক্লোরাইড নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কোটিকোটিপতি মন্ত্রী, এমপিদের বাড়িতে, বাগানে, মাটির নিচে যেসব ঢেউ খেলানো পাত পাওয়া যাচ্ছে, তা টিন নয়। তা করোগেটেড গ্যালভানাইজড আয়রন। গ্যালভানাইজ করার জন্য লোহার সঙ্গে দস্তা মেশানো হয়, এর মধ্যে টিনের তেমন কোনো সংশ্রবই নেই।

সুতরাং, লালু ফালু দুলুর নামের সঙ্গে নির্দোষ টিনের নাম যুক্ত যেন কিছুতেই না করা হয়। করা হলে, তাতে সত্যের অবমাননা হয় আর টিন নামক নিরীহ ধাতুটিকে বেইজ্জত করা হয়।

হ্যাঁ, এই প্রতিবাদপত্র লেখকের মতটা ভেবে দেখার মতো। সে যেখানে নেই, সেখানে তার নামটা রাখা কেন। অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, কলাবাগানে কি কলা আছে, নাকি বাগান আছে? হাতির পুলে পুলও নেই, হাতিও নেই। এমনকি গোলটেবিল বৈঠকের টেবিলগুলো গোল হয় না, যেমন পানিপথের যুদ্ধ আদৌ জলপথে হয়নি।

ওদিকে টিন-এজাররা বলছে, ঢেউটিনের বয়স মোটেও থার্টিন থেকে নাইনটিনের মধ্যে নয় যে তাকে টিন বলা যাবে। এই সিজিআই শিট তথা ঢেউটিন, এটার শুরু ১৮৪০-এর দশকে, আমেরিকায়, তারপর অস্ট্রেলিয়ায়, শেষে এই উপমহাদেশে। ঢেউ খেলানো, হালকা, শক্ত, আর এসব দিয়ে ঘর বানানো সোজা বলে খুব সহজেই জিনিসটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ঘরের ছাদ হিসেবে। অস্ট্রেলিয়াতে এটা শহর অঞ্চলেও খুবই জনপ্রিয় ছাদের উপকরণ।

কাজেই যার ইতিহাস ১৬৭ বছরের, তাকে টিন বলে টিন-এজারদেরও অপমান করার মানে হয় না।

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এই দাবিও মানতে হয়। কিন্তু অপমানের কথাটা আসছে কেন?

কারণটা নিহিত বিএনপি-জামায়াতের বিগত সরকারের এমপিদের কীর্তিকলাপে। এরা, এখন দেখা যাচ্ছে, সর্বভুক। কোটি কোটি টাকার চুক্তি বা ঠিকাদারিতে রাঘববোয়ালেরা বড় বড় হাঁ করেন, এটা সবাই জানে। মেনেও নিয়েছিল। তাই বলে এই কোটিকোটিপতিরা রিলিফের ঢেউটিনের লোভও সামলাতে পারবেন না! এখন যেভাবে এদের মাটির নিচ থেকে 'রিলিফের ঢেউটিন, বিক্রির জন্য নয়' সিলসংবলিত সিজিআই শিট বেরিয়ে আসছে, তাতে মনে হয়, আমাদের দুর্নীতিবাজেরা দুর্নীতিরও জাত মেরে দিয়েছেন। সেই যে কৌতুক আছে–ঘুষখোর বলছেন, পকেটে কত টাকা আছে দে, কোনো টাকা নেই, হাতঘড়িটা খোল, হাতঘড়ি নেই, আরে দশ-বিশ টাকা যা আছে তা-ই দে, কিছুই নেই, তাহলে আমার পিঠটা একটু চুলকে দে, একদম কিছুই দিবি না, তা তো হতে পারে না–আমাদের ক্ষমতাবানেরা এই কিসিমেরই, তাদের সামনে দিয়ে কোনো কিছুই পার পাবে না, না হাতি, না পিঁপড়া।

এই মন্ত্রী-এমপিদের লোভের সঙ্গে কার তুলনা চলতে পারে? কারোরই না। একমাত্র আগুনের হয়তো কিছুটা তুলনা চলে। আগুনের আরেক নাম সর্বভুক। সে সবকিছুকে গ্রাস করতে পারে। তার সহস্র জিহ্বা। আমাদের এই মহান নেতৃবর্গেরও ছিল সহস্র জিহ্বা আর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। নইলে সামান্য ঢেউটিন, যার দাম খুবই কম, যা কেবল গরিবেরই লভ্য ও ভোগ্য হতে পারে, সেটাও কি কেউ আত্মসাৎ করে।

আমাদের লালু ভুলু দুলু ফালু ভাইয়েরা কী মহান, রিলিফের ঢেউটিনই তা প্রমাণ করে ছাড়ল। গত পাঁচটা বছরে, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি নিয়ে ওই জোট দেশটার উন্নতিতে কি বিপুল ভূমিকাই না রাখতে পারত? তারা আমাদের বিদ্যুৎ দিতে পারতেন, শিল্পায়ন করতে পারতেন, সুবিচার দিতে পারতেন, আমাদেরকে একুশ শতকের উন্নয়নের বিশ্বদৌড়ে জুড়ে দিতে পারতেন, তাঁরা সেসবের দিকে গেলেন না, তাঁরা আমাদের দিলেন জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা, দিলেন সীমাহীন দুর্নীতির অভয়ারণ্য। হায় খোদা, এতদিন কাদের হাতে আমরা দিয়ে রেখেছিলাম আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভার।

ভাই ঢেউটিন, ভাই করোগেটেড গ্যালাভানাইজড স্টিল, তুমি মাইন্ড কোরো না, তোমার ইজ্জত খানিকটা গেছে তো বটেই, কিন্তু তুমি আমাদের কথা একবার ভাবো, আমাদের ইজ্জতটা কোন চুলায় গেল, কারণ এরাই ছিলেন আমাদের নেতা। আর ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যে জাতি যে রকম, সে জাতি সে রকম নেতাই লাভ করবে–আমরাই তো ওই টিনখোরদের আমাদের নেতা বানিয়েছিলাম। এইবার তাই চাই এমন সিস্টেম, যাতে টিনখোরেরা আর পাবলিকের ভোট ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে না পারে, ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে গেয়ে উঠতে না পারে, ও ঢেউ খেলে রে, ঝিলমিল টিনেতে ঢেউ খেলে...।

৬ মার্চ ২০০৭

বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর অনুমতি চাই

এ সরকার নানা কাজ করছে, যা এর আগে ছিল অভাবনীয়। সেসব কাজ প্রশংসিত হচ্ছে। সরকার কি আরেকটি কাজ করতে পারে? আমার বাসার ছাদে আমি একটা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়াতে চাই, সরকার কি তার অনুমতি দিতে পারে? বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় বাংলাদেশের বাড়িতে বাড়িতে, আঙিনায় ছাদে আমরা অনেক উড়িয়েছি আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের পতাকা, এমনকি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালির পতাকাও দুর্লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এবার আমরা ওড়াতে চাই বাংলাদেশের পতাকা। বাড়িতে, গাড়িতে, গাছের চূড়ায়। বাংলাদেশ খেলছে বিশ্বকাপে। আমরা পতাকা ওড়াব না? আর্জেন্টিনা এই সেবারও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল, তাই বলে তো দেশে আর্জেন্টিনার পতাকা ওড়ানোয় খামতি ছিল না। আমাদের নিজেদের দেশ খেলছে বিশ্বকাপ, আর আমরা নিজেদের পতাকা ওড়াব না? পতাকা নিয়ে মিছিল করব না? হাবিবুল বাশারের স্ত্রী শাওন বাশার সেই আবেদনই জানিয়েছেন, আপনারা সবাই পতাকা ওড়ান, বাংলাদেশের পতাকা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন করব না? আসলে ১৬ ডিসেম্বর বা ২৬ মার্চ ছাড়া বেসরকারি ভবনে পতাকা ওড়ানোর নিয়ম নেই। আলবদর-প্রধানটি মন্ত্রী হয়ে গাড়িতে পতাকা উড়িয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশে অমন্ত্রীদের, নাগরিকদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ানো বৈধ নয়!

আসলে পতাকা নিয়ে আমাদের কতগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ততা আছে। আমেরিকানদের নেই। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার আইনসভায় একটা বিল তোলা হয়েছিল; জাতীয় পতাকা পোড়ানো যাবে না–এই ছিল বিলের মর্ম। সেটা পাস হয়নি। কারণ পতাকা পোড়ানো নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার, এটাকে নিষিদ্ধ করা যায় না। ওরা পতাকা দিয়ে পোশাকই নয়, অন্তঃপোশাকও বানায়। পতাকা দিয়ে করে না, এমন কোনো কাজ নেই। তাই বলে কি আমেরিকানদের দেশপ্রেম ধুলায় মিশে গেছে। যে দেশে পতাকা পোড়ানো বেআইনি নয়, সেই দেশটা পৃথিবীর

সবচেয়ে বড় প্রতাপশালী দেশ। আর আমরা, আমাদের সোনার ছেলেরা যখন খেলছে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় উৎসবে, ভারতের মতো পরাশক্তিকে হারিয়ে দিচ্ছে ঘোষণা দিয়ে, যখন তাদের কাছে প্রস্তুতি ম্যাচে হেরে গেছে নিউজিল্যান্ডও, যখন 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' বলে গ্যালারিতে নেচে উঠেছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরাও, তখন আমরা কেন মেতে উঠব না আমাদের জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সংগীত নিয়ে।

আমাদের আছে মাশরাফি বিন মুর্তজার মতো স্ট্রাইকার বোলার। প্রকৃতি পেসার, কলার উঁচানো, চোখে আগুন, চিবুকে ইস্পাতের দৃঢ়তা। ১৯৯৬ সালে ডেভ হোয়াটমোর শ্রীলঙ্কাকে চ্যাম্পিয়ন করতে ব্যবহার করেছিলেন প্রথম ১৫ ওভারের ফিল্ডিং বাধ্যবাধকতার সুযোগ, পকেট থেকে বের করেছিলেন জয়াসুরিয়াকে। আমাদেরও আছে তামিম ইকবাল, শাহরিয়ার নাফীস, আফতাব। আমাদের আছে রফিক আর রাজ্জাকের মতো বিশ্বমানের বোলার। আমাদের আছে আশরাফুল, হাবিবুল বাশার। আমাদের আছে সাকিব, মুশফিকুর রহিমের মতো বিস্ময়বালক। আমরা লড়ব। আমরা মাঠে নামার আগে হেরে বসব না। আর আমরা সবাই জানি, ক্রিকেট কেবল দক্ষতা আর যোগ্যতার খেলা না, ক্রিকেট হলো হৃৎপিণ্ডের খেলা। ক্রিকেট হলো স্নায়ুর খেলা। যে যাকে চেপে ধরতে পারে, যে যার ওপরে চড়াও হতে পারে। বাংলাদেশ এবার স্নায়ুর লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ভারতের চেয়ে। সত্যিকারের বাঘের মতো খেলেছে তারা, আর তুলনায় ভারতীয়রা–ক্রিকইনফো ডট কমের সহকারী সম্পাদক আনন্দ বসু লিখেছেন তাঁর লেখায়–খেলেছে মেষশাবকের মতো।

অন্য দেশের হয়ে অনেক খেলা দেখেছি, বিশ্বকাপ ফুটবল আর ক্রিকেট দেখতে কাটিয়েছি অনেক বিনিদ্র রাত। এবার আমরা রাত জাগছি নিজের দেশের জন্য। এবার যদি আমার টিম জেতে, তাহলে আমার দেশও যে জিতে যাবে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা হারায় অনেক কান্নাকাটি করেছি, এবার কাঁদতে চাই নিজের দেশের জয়ের আনন্দে। পরাজয়ের কথাটা এখন আর ভাবতেই চাই না। জিততে থাকুক। কারণ আমাদের হাবিবুল বাশাররাই শিখিয়েছেন, আমরা জেতার জন্য মাঠে নামি এখন, কিশোর তামিম ইকবাল যেমনটা বলেছেন, আমি কোনো নামের বিরুদ্ধে খেলি না, খেলি বোলারের বিরুদ্ধে।

আজকে আমাদের এই জায়গাটায় নিয়ে গেছে আমাদের ক্রিকেট টিম। নিয়ে গেছেন ডেভ হোয়াটমোর। আমাদের সারাক্ষণের প্রার্থনা–খেলোয়াড়েরা সুস্থ থাকুক, সুস্থ থাকুক ডাক্তারের ছুরির নিচে একাধিকার ফালি হওয়া মাশরাফির হাঁটু আর পিঠ। ফরমে থাকুক আমাদের ক্রিকেটাররা। জয় চাই, আরও চাই। অনেক মার খেয়েছি, অনেকবার, আমরা, এই দেশের জনগণ, নানাভাবে–রাজনীতিতে, মিথ্যা

প্রতিশ্রুতিতে, অভাবে, স্বভাবে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়। এইবার আমরা আমাদের দেশ নিয়ে মাতব, হাসব, কাঁদব, ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাব।

আমরা এবার আমাদের বাসায় বাসায় উড়াব জাতীয় পতাকা। মাথায় বাঁধব, হাতে দোলাব, সাইকেলে বাঁধব–এই অনুমতিটা কি সরকার দিতে পারে?

জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পৃথিবীর শক্তিশালীতম দেশ হয়ে টিকে থাকতে পারে, জাতীয় পতাকার আবেগ ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চয়ই আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না?

এই সরকারই সম্ভবত পারে একটা তথ্যবিবরণীর মাধ্যমে এই অনুমতিটা আমাদের দিয়ে দিতে।

(পাদটীকা: এই বছর কে চ্যাম্পিয়ন হবে, সেটা আমি বলব না। *লন্ডন টাইমস*-এর ভারত-বাংলাদেশ খেলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এটা কি বিস্ময়? আসলে অসাধারণ সব প্রতিভা আর প্রচণ্ড প্রাণসঞ্চারী বাংলাদেশ উঠে আসছে, এটা তারই প্রমাণ। এমনকি তারা এবারই প্রথম বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নও হতে পারে।' কিন্তু ক্রিকেট-বিশ্লেষকেরা বলছেন ২০১১ সালে কে চ্যাম্পিয়ন হবে। ওই বিশ্বকাপের একটা স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশ, ১৯৯৬ সালে যেমন ছিল শ্রীলঙ্কা, আর তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন ডেভ হোয়াটমোর, ২০১১ সাল পর্যন্ত যদি তিনি থাকেন, আর সাকিব-মুশফিকুর-তামিমের মতো বিস্ময়কর বালকেরা যদি পাইপলাইনে আসতেই থাকে, আপনিই বলুন, কে হচ্ছে ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন)

২০ মার্চ ২০০৭

কৌতুকগুলো উড়োজাহাজ নিয়ে

এই কৌতুকটা কি আপনাদের আগে শুনিয়েছি? একটা বিমান ছাড়বে সন্ধ্যার সময়। যাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে আসন গ্রহণ করলেন। বিমানও হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ বৈমানিক টের পেলেন, পেছনের ইঞ্জিনে একটা বিশ্রী অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে। তিনি যাত্রা স্থগিত করলেন। যাত্রীরা বিরক্ত। অনিশ্চয়তা গ্রাস করছে তাঁদের। ঘণ্টা তিনেক পরে আবার বিমান যাত্রা শুরু করল। একজন যাত্রী বিমানসেবককে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেরি হলো কেন?'

'পাইলট ইঞ্জিনে অস্বাভাবিক শব্দ পাচ্ছিলেন।'

'ইঞ্জিন কি সারানো হয়েছে?'

'জি না। একজন নতুন পাইলট খুঁজে বের করা হয়েছে। ইনি কানে কম শোনেন।'

বাংলাদেশ সম্পর্কে এই কৌতুকটা খুব খাটে। আমরা সিস্টেম বদল করিনি, বারবার কেবল শাসক বদল করেছি। ফলে বারবার আমাদের প্রত্যাশা ভঙ্গ হয়েছে। দুর্নীতি আকাশ ছুঁয়েছে, সন্ত্রাস আমাদের নামিয়েছে অতল গহিনে।

এবার দরকার ব্যবস্থা বদল।

তাহলে আবার সেই পুরোনো কৌতুকটাই বলি।

বিমান বলতে বাংলাদেশ বিমান মনে হয়। তাই বিমানের বদলে উড়োজাহাজ বলি।

একটা উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। যাত্রী, চালক, ক্রু–সবাই মারা গেছেন। ব্লাকবক্সও পাওয়া যায়নি। শুধু একটা বাঁদর বেঁচে আছে। বাঁদরটাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো, যাতে সে মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। আর জিজ্ঞাসার জবাব সে দেয় হাত-পা নেড়ে, সাংকেতিক ভাষায়।

বাঁদরকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'বিমান যখন দুর্ঘটনায় পড়ে, তখন যাত্রীরা কী করছিল?'

বাঁদর দুই হাত কানের কাছে ধরে চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে ঘুমের ভান করল। 'ঘুমাচ্ছিল'–সবাই বুঝে ফেলল।

'বিমানসেবকেরা কী করছিল?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিল'–বাঁদর দেখাল।

'চালকেরা কী করছিল?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিল'–একই কায়দায় দেখাল বাঁদরটি।

'তাহলে তুই বান্দর কী করছিলি?'

বাঁদর তখন ককপিটে বসে যন্ত্রপাতি নাড়ার ভঙ্গি করল, অর্থাৎ সে-ই বিমানটা চালাচ্ছিল।

বাঁদর যদি বিমান চালায়, তাহলে সেই বিমান ভূপাতিত হতে বাধ্য। অযোগ্য লোকেরা যদি দেশ চালায়, সেই দেশও সুন্দরভাবে চলতে পারে না। প্রবাদ আছে, সম্ভবত খনার প্রবচন, রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রজার কষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। আবার ইংরাজিতে একটা কথা আছে, যে জাতি যে রকম, সে জাতি সেই রকম নেতৃত্বই পায়। আসলে এই সব লালু-ভুলু-লালু-ফুলুদের তো আমরাই নির্বাচিত করি।

সত্য বটে, আমাদের বিকল্প থাকে না। আমরা ভোট না দিলেও তাঁরাই নির্বাচিত হবেন।

বিকল্পের ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার বিকল্প খোঁজার কথা আমাদের মনে আসছে, এতদিনে।

তবে আবার আসি গোড়ার কৌতুকটাতে, ব্যবস্থা বদল না করে শুধু লোক বদলালে লাভ নেই।

আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাটা আগাগোড়া খারাপ।

বঙ্গবন্ধু নাকি বলেছিলেন, সব দেশ পায় সোনার খনি, রুপার খনি, আমি পাইছি চোরের খনি।

আচ্ছা উড়োজাহাজ নিয়েই আরেকটা কৌতুক বলি। এইটা নতুন।

একজন প্রকৌশলী আর একজন কম্পিউটারবিদ যাচ্ছেন পাশাপাশি আসনে বসে, উড়োজাহাজে। কম্পিউটারবিদ বললেন, 'আসেন, একটা খেলা খেলি।' প্রকৌশলী বললেন, 'না, আমি ঘুমাব।' কম্পিউটারবিদ খানিকক্ষণ পরে আবার বললেন, 'খেলাটা কী খেলব, শোনেন; তাহলে আর আপনি না করতে পারবে না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, উত্তর না পারলে আপনি দেবেন পাঁচ ডলার। তারপর আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করবেন, আমি না পারলে আপনাকে দেব পাঁচ ডলার।'

'ভাই আমি ঘুমাব'–প্রকৌশলী বিরক্ত।

'আচ্ছা, আপনি না পারলে দেবেন পাঁচ ডলার, আর আমি না পারলে দেব ১০০ ডলার।'

এইবার প্রকৌশলী রাজি হলেন।

কম্পিউটারবিদ প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত?' প্রকৌশলী উত্তর খোঁজার চেষ্টা না করে পাঁচ ডলার বের করে দিলেন।

এবার প্রকৌশলীর প্রশ্ন করার পালা। তিনি বললেন, 'বলেন তো, কোন জিনিসের তিন পা, পাহাড়ে গেল, ফিরে এল চার পা নিয়ে?'

কম্পিউটারবিদ তাঁর ল্যাপটপ খুলে বসলেন, নানা ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটলেন, ইন্টারনেট অন করে জ্ঞানী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, শেষে উত্তর না পেয়ে ১০০ ডলার দিতে বাধ্য হলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আসলে আপনিই বলুন তো, জিনিসটা কী?'

প্রকৌশলী আবার পাঁচ ডলার বের করে হাতে ধরিয়ে দিলেন কম্পিউটারবিদের। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই গল্প কেন করলাম? কারণ, আমিও তো একসময় প্রকৌশলীই ছিলাম। আপনি যদি আমাকে বলেন, এই যে প্রশাসন, এই যে পুলিশ, এই যে প্রকৌশলী, এই যে কাস্টমস, এই যে জমি রেজিস্ট্রি অফিস, এই যে...তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বলা যায়, অন্তত আশি ভাগ দুর্নীতিবাজ (কম বা বেশি), এদের নিয়ে একটা দুর্নীতিমুক্ত দেশ কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

আমি তখন আপনাকে পাঁচ ডলার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নাই।

আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটা কথা বলেন। তিনি বলেন, এর আগে আমরা অত্যাচারী রাজা দেখেছি, কিন্তু রাজা নিজে চোর, সেটা এর আগে দেখিনি, যা আমাদের কালে দেখা গেল। সেইটা ভয়ঙ্কর।

হয়তো একটা জিনিস চাওয়া যেতে পারে, রাজা যেন নিজে চোর না হন।

বিমানসংক্রান্ত আরেকটা কৌতুক বলে এবার শেষ করব। উড়োজাহাজটি ছিল ছোট্ট। ভেঙে পড়েছিল একটা কবরস্থানে। সন্ধ্যার সময় পুলিশ বলল, এ পর্যন্ত ২৮০টা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পুলিশের আশঙ্কা, আরও দেহাবশেষ পাওয়া যাবে। কারণ খননকাজ অব্যাহত আছে।

খুঁড়তে থাকলে আরও অনেক কেঁচো ও কেউটে সাপও পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হলো, আপনি খুঁড়বেন কোথায়। কাগজে দেখলাম, বাংলাদেশের কোথায় নাকি মাটিতে স্বর্ণরেণু মিলছে। সোনার খনি আছে কি না, জানি না; এই মাটিতে চোরের খনি আছে বলে জাতির পিতা বলে গেছেন।

৩ এপ্রিল ২০০৭

কোটি টাকা কে পাবে, আসেন ঠিক করি

বহুদিন আগে একটা গদ্যকার্টুন লিখেছিলাম: 'ভাগ্যিস মনের কথাটি পড়ার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি আজও'।

তাতে দেখিয়েছিলাম, এ ধরনের একটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে কী সর্বনাশটা হতো! মানুষ মুখে বলত এক কথা, আর যন্ত্রে পঠিত হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সংসারে তুমুল হট্টগোল লেগে যেত।

ধরা যাক, এরকম একটা যন্ত্র এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। আর আমাদের জনসভায় এক সমর্থক তাঁর সমর্থিত সাংসদ পদপ্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এভাবে:

ভাইসব। আমাদের এলাকা থেকে একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবককে নির্বাচিত করতে হবে। যাকে-তাকে নির্বাচিত করলে চলবে না। নির্বাচিত করতে হবে একজন দেশপ্রেমিক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে। তিনি হবেন আমাদের এলাকার সংসদ সদস্য। জনপ্রতিনিধি। তিনি সংসদে গিয়ে আমাদের পক্ষে কথা বলবেন। আমাদের হয়ে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেবেন। দেশের জন্য ভালো হয়, এ রকম আইন তিনি প্রণয়ন করতে সহায়তা করবেন। সব আইনকানুন থাকবে তাঁর নখদর্পণে।

তিনি প্রস্তাবিত বিলের পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তি উত্থাপন করবেন। তিনি নিজের সময়কে সময় বলে মনে করবেন না, জনগণের খেদমতে তাঁর মূল্যবান সময় উৎসর্গ করে সংসদে নিয়মিত হাজির থাকবেন। নিজের আয়-উন্নতির দিকে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ থাকবে না। জনগণের ভালোর জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দেবেন। ইত্যাদি।

কিন্তু মনের খবর পড়ার যন্ত্রটা কাজ করতে শুরু করলে এই বক্তার বক্তব্যটা শোনা যাবে এ রকম:

ভাইসব, আমাদের এলাকা থেকে একজন লোককে নগদ এক কোটি টাকা দেওয়া হবে। সবাইকে দেওয়া যাবে না। মাত্র একজনই পাবে টাকাটা। কাজেই

এখন আমাদেরকে ঠিক করতে হবে কে এই টাকাটা পাবে। কে পাবে, সেটা সরকার ঠিক করবে না। আমরাই ঠিক করব।

তো ঠিক করার উপায় কী? আসেন, ভোট করি। একজনকে আমরা ভোট দিয়ে নগদ এক কোটি টাকা লাভের সুযোগ করে দিই।

শুধু এক কোটি টাকা নয়, তিনি আরও টাকা-কড়ি পাবেন। তাঁর যদি টিনের ঘর থাকে, তাঁর জায়গায় বড় বড় বিল্ডিং হবে। খালি তাঁর না, তাঁর ভাগ্নে-ভাস্তেদের কপাল ফিরে যাবে।

ব্যাপার কী? ব্যাপার খুবই খোলামেলা। কোনো রাখঢাক নেই। আমরা আমাদের এলাকা থেকে একজনকে নির্বাচিত করব। তাঁকে বলা হবে এমপি বা মেম্বার অব পার্লামেন্ট। এই এমপি সাহেব বিদেশ থেকে বিনা শুল্কে একটা গাড়ি আনাতে পারবেন। তো ধরা যাক, তিনি এক কোটি টাকা দামের একটা গাড়ি আনাবেন। অন্য কেউ এ রকম একটা গাড়ি আনলে তাঁকে কমপক্ষে দুই কোটি টাকা শুল্ক দিতে হতো। কাজেই গাড়ির দাম পড়ত তিন কোটি টাকা। তো এমপি সাহেব কোনো বড়লোকের কাছে তাঁর গাড়িটা আগাম দুই কোটি টাকায় বিক্রি করে দেবেন। তাহলে তিনি নগদ নগদ লাভ করবেন এক কোটি টাকা।

কাজেই আসেন, আমরা আমাদেরই মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করে তাঁর আত্ম সেবার সুযোগ করে দিই।

এই ভাগ্যবান লোকটি কেবল যে গাড়ি বেচে এক কোটি টাকা পাবেন, তাই নয়। আল্লাহ দিলে তিনি আরও বহু কিছু পাবেন। ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট। ইনডাইরেক্টগুলো পরে বলি। আগে ডাইরেক্টগুলো বলে নিই।

তিনি সরকারি প্লট পাবেন। তিনি ন্যাম ফ্ল্যাট পাবেন। তিনি প্রতিবছর এলাকায় ব্যয়ের জন্যে টাকা পাবেন। এলাকায় বিলি-বণ্টনের জন্যে গম পাবেন। রিলিফের ঢেউটিন পাবেন। এসব তিনি তাঁর স্বভাবচরিত্র অনুযায়ী ব্যবহার করবেন।

কাজেই আমরা যাকে নির্বাচিত করব, তার খাসলতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার কোনো ত্যাগী নেতা, স্কুলের শিক্ষক, সাধুপুরুষকে নির্বাচিত করে লাভ নাই। কোটি টাকার মর্ম সে বুঝবে না।

এলাকার কোনো বড়লোককেই নির্বাচিত করা ভালো। যার টাকা আছে, তার আরও টাকা হলে আমাদের সহ্য হবে, কিন্তু যার নাই তাকে হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখলে আমাদের চোখ টাটাবে।

তবে সবচেয়ে ভালো হয়, যদি এলাকার সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্ত-ডাকাত-চোরটাকে আমরা নির্বাচিত করি। কারণ তাহলে সে এসব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমাদের ঘরে আর সিঁদ কাটবে না।

কী বলছেন? তিনি হবেন আইনপ্রণেতা? আইন প্রণয়ন করবেন? দেশের আইনকানুন তাকে বুঝতে হবে? কী বললেন, তিনি হবেন সরকারের নীতি-নির্ধারক? তিনি এসব বিষয় নিয়ে ভাববেন, সংসদে দাঁড়িয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখবেন! কিসের! তাঁকে সংসদে উপস্থিতই হতে হবে না। আর হলেও তিনি ভাতা পাবেন।

তবে হ্যাঁ, জরুরি প্রয়োজনে হুইপ সাহেব তাঁকে ডেকে সংসদে উপস্থিত করতে পারেন। তখন তিনি হাত তুলবেন। হুইপ যেদিকে হাত তুলতে বলবেন, সেদিকেই তুলবেন। এ জন্য লেখাপড়ারও দরকার নেই, বুদ্ধিবিবেচনাও দরকার নেই। কারণ বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করারই কোনো অবকাশ নেই। হুইপের কথার বাইরে ভোট দিলে তার চাকরিই চলে যাবে।

শুধু কি টাকাকড়ি? তাঁর থাকবে অসীম ক্ষমতা। তিনি এলাকার সব স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির প্রধান হবেন। থানা চলবে তাঁর কথায়। কে গ্রেপ্তার হবে, কাকে ছাড়া হবে, সব কিছু চলবে তাঁর হুকুমে। কোনো নিয়োগ, কোনো টেন্ডার তাঁর ইশারা ছাড়া ঘটবে না। ইত্যাদি...

অতএব যে কথা বলতে হয়:

সংসদ সদস্য হওয়া মানে তো লটারিতে কোটি টাকা জিতে যাওয়া নয়। আইনপ্রণেতাদের পদটিকে লাভজনক করে তুলে আমাদের সংসদ নির্বাচনকে যুদ্ধকর্ম করে তোলা হয়েছে। আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যাতে তাদের ক্ষমতার নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠা রোধ করতে না পারে, সেজন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি।

সংসদ সদস্য পদটাকে করে তোলা উচিত এমন, যেন এই পদে যিনি অধিষ্ঠিত হবেন, তিনি সত্যিকারের আদর্শবাদী ও ত্যাগী মানুষটি হন। এটা এতই অলাভজনক একটা পদ হবে যে, এই পদে দাঁড়ানোটাকে কেউ বিনিয়োগ হিসেবে দেখবেন না। দেখবেন আত্ম ত্যাগের এক চরম পরীক্ষা হিসেবে।

আর শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে।

১ মে ২০০৭

অপারেশন থিয়েটার নিয়ে কৌতুক

গত মঙ্গলবার 'অরণ্যে রোদন' কলামে লিখেছিলাম, ব্যথা দিয়েও ব্যথার নিরাময় সম্ভব। স্থায়ীভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সাময়িকভাবে অধিকার স্থগিত রাখার দরকার হতে পারে। সেটা সবাইকে মেনে নিতেও হয়। যেমন, স্থায়ী সুস্থতার জন্যে অস্ত্রোপচারের দরকার পড়তে পারে। আর অস্ত্রোপচারের সময় খানিকটা রক্তপাত ঘটবে, রোগীকে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হবে, তার চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রিত থাকবে–এতে কেউ আপত্তি করবে না। এটা করা হয় রোগীর ভালোর জন্যে। আমাদের দেশেও আমরা এখন পার করছি তেমনি জরুরি অবস্থা, আমাদের মৌলিক অনেক অধিকারই এখন স্থগিত। এটা আমরা মেনে নিচ্ছি ভবিষ্যতে যাতে আমরা ভালো থাকি, নিরাপদ থাকি, সব অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারি সে জন্যে।

এই কথা বলতে গিয়েই অপারেশন নিয়ে নানা কৌতুক মনে পড়ে গিয়েছিল। অরণ্যে রোদনে তা বলতে পারিনি। গদ্যকার্টুনে বলে ফেলি।

রোগী গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। তার দুই হাতের অবস্থাই খারাপ। ডাক্তার অতিকষ্টে অপারেশন শেষ করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। কয়েক দিন পর রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের দেখা। হাতে তখনো ব্যান্ডেজ। রোগী বলল, ডাক্তার সাহেব, আমি কি সুস্থ হওয়ার পর পিয়ানো বাজাতে পারব?

ডাক্তার হেসে বললেন, না পারার আমি কোনো কারণ দেখছি না।

রোগী বলল, এটা হবে সপ্তমাশ্চর্য।

ডাক্তার বললেন, আজকাল মেডিক্যাল সায়েন্স অনেক উন্নত হয়েছে।

রোগী বলল, তা জানতাম। কিন্তু এতটা উন্নতি করেছে তা জানতাম না। কোনো দিনও যে পিয়ানো বাজাতে শেখে নাই, অপারেশনের পর কিনা সেও পিয়ানো বাজাতে পারে!

আমরা এই সরকারের কাছে যেন এত বেশি কিছু আশা না করি, যা করার জন্যে আমরা নিজেরা যোগ্য হয়ে উঠিনি।

আরেকটা কৌতুক। হাসপাতালে অপারেশন টেবিল থেকে রোগী পালিয়ে গেছে। দারোয়ানেরা তাকে ধরে আনল। হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ বলল, আপনি পালাচ্ছিলেন কেন?

কারণ নার্স বলছিল, ভয় পাবেন না। অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন খুব সোজা।

হ্যাঁ সোজাই তো। তাহলে আপনি পালালেন কেন?

কারণ, নার্স আমাকে সাহস দিচ্ছিল না, সে সাহস দিচ্ছিল ডাক্তার সাহেবকে।

আসুন আমরাও জনগণকে অভয় দিই, দেশচালনা খুব সোজা। এমনকি খালেদা-হাসিনাও এই দেশ চালিয়েছেন।

কিন্তু অপারেশন কি খুব সোজা?

একবার একজন হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ তাঁর গাড়িটা নিয়ে গেলেন মেকানিকের কাছে। গাড়ির মিস্ত্রি ইঞ্জিন খুলল, ভাল্‌ভ বদলাল, আবার গাড়িটা স্টার্ট নিল ঠিকমতো। মিস্ত্রি বলল, আপনিও তো ডাক্তার সাহেব একই কাজ করেন, হার্ট ওপেন করেন, ভাল্‌ভ বদলে দেন। আপনি এত টাকা নেন। অথচ আমাকে কম টাকা দেন কেন?

ডাক্তার বলল, মিয়া তুমি যখন ইঞ্জিন ওপেন করেছ, তখন তোমার ইঞ্জিন তো বন্ধ ছিল। ইঞ্জিন চালু রেখে খুলে ভাল্‌ভটা বদলাও দেখি!

তাই তো। এই দেশের শাসনব্যবস্থার ওপর এখন চলছে অস্ত্রোপচার। কিন্তু তা করতে হবে দেশটাকে চালু রেখে। প্রশাসন চলবে, অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে, আবার সারাইয়ের কাজও করতে হবে। কাজটা কঠিন।

দাঁতের ডাক্তারের গল্পটা আবার বলি। রোগী বলল, এর আগে যেবার দাঁত তুলেছিলাম, সেবার খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। এবার তো একদমই টের পেলাম না। ডাক্তার বলল, একটু ভুল হয়ে গেছে, আমি আপনার দাঁতের বদলে আলজিভটা তুলে ফেলেছি।

অপারেশন টেবিলে ভুল করার কোনো অবকাশ নাই–এই কথাটা বারবার বলি। পেট কাটার পর যদি দেখা যায় অবস্থা বেশি খারাপ, ক্ষততে হাত না দিয়েই ডাক্তাররা পশ্চাদপসরণ করেন। না। এই রোগী সারবে না। আমাদের অবস্থা কি অত খারাপ?

এইবার আমি মাথাব্যথার রোগীর কৌতুকটা বলতে যাচ্ছি। অধিকতর সুরুচিসম্পন্ন পাঠকেরা এটা না পড়লেই ভালো করবেন।

জনের ভীষণ মাথাব্যথা। ব্যথার চোটে সে অস্থির। সে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বললেন, আপনার রোগটা ভালো হবে, কিন্তু আপনার মূল্যবান অঙ্গ বিসর্জন দিতে হবে। আপনার টেস্টিকলস আপনার মেরুদণ্ডে আঘাত করছে, তা থেকে এই মাথাব্যথা। আপনি যদি টেস্টিকলস ফেলে দিতে রাজি হন...

মাথানাথায় আঙ্গুল জন অপারেশন করাতে রাজি হলো। অপারেশনের পর সে হয়ে উঠল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। মাথাব্যথা নেই। কী আরাম!

সে দোকানে গেল। বলল, শার্ট দিন।

আপনার লাগবে ৪২ সাইজ।

জানলেন কী করে?

২০ বছর ধরে আমি এই দোকানের সেল্‌সম্যান।

আমাকে একটা প্যান্ট দিন।

আপনার লাগবে ৪৪।

কী করে জানলেন?

২০ বছর ধরে আমি এই দোকানে এই কাজ করছি।

আমাকে একটা আন্ডারঅয়্যার দেন।

আপনার লাগবে ৩২।

এইবার হয়নি। আমি ২০ বছর ধরে ২৮ সাইজ পরে আসছি।

কী বলেন! তাহলে তো আপনার মাথা ব্যথা করবে। কারণ তাতে আপনার টেস্টিকল লাগবে আপনার মেরুদণ্ডে ।

এইবার জনের গলা ছেড়ে কান্নার পালা।

তাই বলি, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

১৫ মে ২০০৭

ইঁদুর, ঘাস আর উড়োজাহাজের গল্প

প্রথমেই একটা কৌতুক বলে নিই। আমার ধারণা, এই কৌতুকটা এর আগেও আমি আপনাদের শুনিয়েছি। কিন্তু প্রসঙ্গ এসে গেলে পুরোনো কৌতুকও বলা যায়, শোনাও হয়তো যায়।

একজন বিশাল বড়লোক। যাচ্ছেন তাঁর খুবই দামি গাড়িতে চড়ে। ধরা যাক, গাড়িটার নাম পোরশে, লিংকন, হামার, মার্সিডিজ বা এই রকম একটা কিছু। গাড়ির নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি হয় মন্ত্রী বা এমপি, নিদেনপক্ষে সরকারি লোকজনকে নিয়মিত চাঁদা দেওয়া ব্যবসায়ী। মন্ত্রী, এমপি বা বিশেষ ভবনের পরিচয়ে পরিচিত।

গাড়ি চলছে হাইওয়ে ধরে। একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনি নামলেন হাওয়া খেতে। দেখতে পেলেন পথের ধারে দুজন লোক ঘাস খাচ্ছে।

তিনি তাদের বললেন, এই তোমরা ঘাস খাচ্ছ কেন?

লোকদুটো বলল, আমাদের এখানে খুব মঙ্গা চলতেছে।

মঙ্গা কী?

মঙ্গা মানে বুঝলেন না। মানে খুবই আকাল পড়ছে। কাজকাম নাই। ট্যাকা নাই। ভাত নাই। খিদার জ্বালায় আমরা ঘাস খাই।

আচ্ছা তাহলে তোমরা ওঠো আমার গাড়িতে।

গাড়িতে উঠে হামরা কই যামো?

তোমাদের সিলেটে নিয়ে যাব। আমার বাগানবাড়িতে।

কিন্তু হামরা তো একলা একলা যাবার পারমো না। হামার ছাওয়া আছে। বউ আছে।

ওদেরও নিয়ে আসো। আমি সবাইকে নিয়ে যাব।

স্যার, তোমার দয়ার শরীল। এতগুলা মানষেক তোমরা নিয়া যাইবেন।

হ্যাঁ। তা তো যাবই। আমার বাগানবাড়িতে বড় বড় ঘাস হয়েছে। তোমরা ওগুলো খাবে।

২.

একজন পর্যটক কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিপণি বিতানগুলোয় কেনাকাটা করছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা পিতলের ইঁদুর। বেশ বড়সড় ইঁদুরটা। তিনি বললেন, ইঁদুরটার দাম কত?

দোকানি বলল, ইঁদুরটার দাম ২০ টাকা। কিন্তু এর সঙ্গে একটা গল্প আছে, সেটার দাম ৫ হাজার টাকা।

পর্যটক বললেন, আমি গল্প চাই না। শুধু ইঁদুরটাই কিনতে চাই।

২০ টাকা দিয়ে ইঁদুরটা কিনে বেরুতে না বেরুতেই তাঁর পিছু নিল কয়েকটা জ্যান্ত ইঁদুর।

পর্যটক ভয়ে দৌড়াতে লাগলেন। তখন তার পেছনে তিনি দেখতে পেলেন গায় গায় ইঁদুর।

তিনি আরও জোরে দৌড়াতে লাগলেন।

পেছনে তাকিয়ে দেখলেন শত শত ইঁদুর তাঁর দিকেই ধেয়ে আসছে।

তাঁর জিভ বেরিয়ে আসতে লাগল। পুরো শরীর ঘামে ভিজে গেছে। তিনি হাঁপাচ্ছেন।

কিন্তু থামলে চলবে না। পিছে তাকিয়ে দেখলেন হাজার হাজার ইঁদুর কিলবিলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে।

তিনি দৌড়াতে লাগলেন সমুদ্রের দিকে। বালিতে তাঁর পা আটকে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর থামার উপায় নেই।

একবার পেছনে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন লাখ লাখ ইঁদুর।

তিনি দৌড়ে সমুদ্রের পানিতে পৌঁছে কাঁধের ইঁদুরটা ছুড়ে ফেলে দিলেন পানিতে।

তারপর তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। দেখতে পেলেন লাখ লাখ ইঁদুর ভেসে গেল সমুদ্রের জলে।

তিনি দোকানে ফিরে গেলেন।

দোকানি বলল, কী ভাই, গল্পটা কি এবার আপনি জানতে চান?

পর্যটক বললেন, না, জানতে চাই না। আপনার কাছে কি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদের পিতলের মূর্তি হবে। ওটার দাম যত টাকাই হোক, আমি কিনতে চাই।

৩.

একজন বিমানযাত্রী উড়োজাহাজে উঠে দেখেন তাঁর পাশের সিটে বসে আছে একটা তোতাপাখি।

তিনি বিস্মিত। বিস্ময় গোপন রেখে তিনি বিমান সেবিকাকে বললেন, এক কাপ কফি দেবেন প্লিজ।

আর তোতাপাখি বলল, এই মেয়ে, এক গ্লাস পানীয় দে।

অপমানিত বিমান সেবিকা পানীয় নিয়ে এল। কিন্তু কফির কথা গেল ভুলে।

একটু পরে যাত্রী আবার বললেন, এক কাপ কফি দেবেন প্লিজ। সঙ্গে সঙ্গে তোতাপাখি চেঁচিয়ে উঠল, এই মেয়ে, আরেকটা পানীয় দে।

বিমানবালা এবারও কফিটার কথা ভুলে গিয়ে তোতাপাখির জন্য পানীয়ই এনে দিল।

যাত্রী ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আরে ছোটলোকের বেটি তোকে যে দুই দুইবার কফি দিতে বললাম, কফি দিলি না কেন। বদমাশ, এক লাথিতে দেব ঠ্যাং ভেঙে।

তখন দুজন দশাসই লোক এসে জরুরি নির্গমন পথ খুলে তোতাপাখি আর যাত্রী দুজনকেই ফেলে দিল আকাশে।

পড়তে পড়তে তোতাপাখিটা যাত্রীকে বলল, তুমি তো উড়তে জানো না। তাহলে তুমি এভাবে গালিগালাজ করতে গেলে কেন।

এটা কিন্তু একটা কাজের উপদেশ। যিনি উড়তে জানেন না, তিনি কথা কম বলুন।

৪.

দুজন শিকারি একটা ছোট্ট উড়োজাহাজ ভাড়া করে চলল শিকার করতে। একটা বনভূমির পাশে গিয়ে তারা ছয়টা মোষ শিকার করল।

সেই মোষ ছয়টা নিয়ে তারা বিমানে ফিরে এসে বলল, এগুলো সমেতই তারা ফিরবে।

বৈমানিক বললেন, এত ছোট জাহাজে ছয়টা মোষ নেওয়া যাবে না। বড়জোর চারটা নেওয়া যাবে।

শিকারি দুজন বলল, না, গত বছর তো এই সাইজের বিমানেই আমরা ছয়টা মোষ নিয়ে ফিরেছিলাম।

বৈমানিক আপত্তি করলে তারা বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। বৈমানিক রাজি হলো। ছয়টা মোষ নিয়ে বিমান উড়ছে। একটু পরেই বিমানের ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর বনের ওপরে গাছের ওপরে সেটা ভেঙে পড়ল।

ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এল শিকারি দুজন। গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, গত বছরও প্লেনটা এই জায়গাতেই ভেঙে পড়েছিল।

৫.

আমরা আর ভেঙে পড়তে চাই না। কাজেই ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। বিমান নিয়ে যাত্রা শুরুর আগেই আমাদের ভাবতে হবে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব তো!

২৬ জুন ২০০৭

ইলিশ নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ

তখন পড়ি ক্লাস টুয়ে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, মাছের রাজা কী, বলো। উত্তরটা আমাদের সবার জানা ছিল। আমরা হাত তুললাম। তুমি বলো। ইলিশ। তুমি বলো। ইলিশ। তুমি? ইলিশ। স্যার মাথা নাড়ছেন। তখন একজন বলল, তিমি মাছ। স্যার বললেন, হয়নি। শাকের রাজা পুঁই, মাছের রাজা রুই।

সেই থেকে রুইকেই কুলীন বলে মানি। আর ইলিশ ছোটবেলায় ছিল প্রায় প্রধান খাদ্য। ভাতের পরেই। আম্মারা প্রায়ই গল্প করতেন, তোরা আর কী মাছ খাস বাপু, মাছ পাওয়া যেত তোদের দাদার বাড়ির নদীতে, পোলো দিয়ে মাছ ধরা হতো, একেকটা মাছ ছিল তোদের চেয়েও বড়। সেই নদী মরে গেছে, বড় মাছ তখন কেবলি স্মৃতি, তখন বাঁধা মাইনের টাকায় টানাটানির সংসারে আব্বার বড় মাছ কেনার শখটা পূরণ হতো কেবলই ইলিশ মাছ কিনে। মাঝেমধ্যেই আব্বাকে দেখতাম এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনে এনেছেন। তা সে যত রাতেই আসুক না কেন, আব্বা বলতেন, আজকেই রাঁধো। বলা যায় না, সকালে কী হয়!

রাতে বাজার করার একটা কারণ ছিল রংপুর পৌরবাজারে যেদিন ইলিশের ব্যাপক আমদানি হতো, সেদিন মাছের দাম পড়ে যেত, সেই জরুরি খবরটা আব্বা হয়তো পেয়েছেন একটু বেশি বেলা করে। কাজেই রাতের বেলা আব্বা চললেন ইলিশ কিনতে।

তখন দিনের পর দিন দুবেলা ইলিশ খেতে হতো। কত আর খাওয়া যায়! কাজেই ইলিশ মাছটা যে একটা বিশেষ রকমের সম্মানীয় মৎস, ছোটবেলায় তা বুঝতে পারিনি। বরং পর পর দুবেলা ইলিশ পাতে পড়তে দেখলে বাড়ির সদস্যরা একটু প্রতিবাদ মতো করার চেষ্টা করত।

কিন্তু আজ বুঝি, আ হিলশা ইজ আ হিলশা ইজ আ হিলশা। ইলিশ কেবল মাছ নয়, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, আবার শুধু জাতীয় মাছ নয়, এ আমাদের সংস্কৃতি। কথাটা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বকোষেও উঠে গেছে। বিশ্বাস না হলে যে কেউ

উইকিপিডিয়ার সাইটে ইলিশের পরিচ্ছেদে ঢুঁ মেরে আসুন। হিলশা ইজ নট জাস্ট আর ফিশ টু বেঙ্গলিজ। ইট ইজ আ পার্ট অব দেয়ার কালচার।

তবে ইলিশ বাংলার বাইরেও আরও কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম পাল্লা। আর নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে ধরা পড়া মাছের নাম মাদার। খোট্টা মুল্লুকে পৌঁছার পর সেই একই মাছের নাম হয় হিলশা। ভাবছেন, এই বেটা গদ্যকার্টুনের লেখক তো বেশ জ্ঞান ফলাচ্ছে। হেই বেটা, তোর কাছে কি আমরা জ্ঞানের কথা শুনতে চাইছি?

জনাব, এ সকলই সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিবেশিত তথ্য। তিনি বলছেন, দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি লঙ্কা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পূজা দিই, বাদবাকিরা ও-রকম ধারা পারে না।

সৈয়দ সাহেব ইলিশ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মারাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশতের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই।'

এইখানটায় দেখা যাচ্ছে, আমির-ফকির ভেদ ঘুচে গেল। বড় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী আর ছোট লেখক আনিসুল হকের একটা বিষয়ে দুর্বলতা। ইলিশ। জগৎ ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি তোমার দেশে–মাতা বাংলা, আমাকে ফি বর্ষায় মনটা ভরে ইলিশ খেতে দিয়ো মা। যদি দাও তো, তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি রব এই বাংলায়...

কিন্তু ইলিশ এই বাংলাদেশেই মহার্ঘ্য হয়ে গেল। নিউইয়র্কের ভাবিরা দাওয়াত দিয়ে কী রকম গর্বিত গ্রীবা নেড়ে চাঁচ বাড়িয়ে পাতে তুলে দিচ্ছেন ইয়া বড় একটা ইলিশের টুকরা। জানেন, এখন দেশের চেয়ে এখানেই আমরা ইলিশ খাচ্ছি ভালো।

উইকিপিডিয়াই লিখেছে, বাংলাদেশের ইলিশ সর্বত্র রপ্তানি হচ্ছে, ইউরোপে, আমেরিকায়, ইউরোপের বাঙালি অধ্যুষিত গ্রোসারি শপে দিব্যি পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ। কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ নাকি পাওয়া যেত, বাংলাদেশের তুলনায় কম দামেই।

কলকাতাওয়ালাদের জন্যে ইলিশটা আবার কেবল সংস্কৃতি নয়, নস্টালজিয়া। এপার বাংলা থেকে যাঁরা গেছেন ওই পারে, তাঁরা যতই রূপনারায়ণ নদী থেকে ধরা কলাখাটের ইলিশ খান না কেন, পদ্মার ইলিশের স্মৃতি তাঁদের পিছু ছাড়ে না। হায়! কী সব দিনই না পেছনে ফেলে এসেছি। আর ইলিশও নচ্ছার ধরনের মাছ, সমুদ্রে হয়, সমুদ্রে ধরাও পড়ে, কিন্তু তাতে স্বাদ হয় না, সে নদী বেয়ে উজানে, ১২০০ কিলোমিটার অবধি উজানে উঠে যেতে পারে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গার মাছেই পাওয়া যাবে কেবল ওই স্বর্গীয় অমৃত স্বাদটা। এমনকি চাঁদপুরের জেলের একই

নৌকার একই খ্যাপ থেকে নামানো ইলিশের দুটো দুই জায়গা থেকে ধরা এবং জেলেরা জানে, এর মধ্যে একটা হলো এক নম্বর, আরেকটা হলো দুই নম্বর।

ইলিশ বাঙালি কিন্তু সেই আদি যুগ থেকেই খেয়ে আসছে। যদিও বাঙালিকে মাছখেকো বলে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিন্দাও কম করেনি। আবার দশ বা এগারো শতকে ভবদেব ভট্ট নামের এক বাঙালি শাস্ত্রকার নানা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, মাছ খাওয়া কত ভালো। জীমূতবাহন ইলিশ মাছ আর ইলিশ মাছের তেলের প্রশংসা করেছেন। বারো শতকে সর্বানন্দ যখন মাছের নিন্দা করেছেন, তখনো ইল্লিশের কথা তিনি ভুলে যাননি। (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ)। মধ্য যুগের সাহিত্যে অন্য অনেক মাছের সঙ্গে ইলিশ মাছেরও উল্লেখ আছে।

গোপাল ভাঁড়ের হাসির গল্পে আছে। রাজা বলছেন, গোপাল, তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে। হাট থেকে ইলিশ মাছ কিনিয়ে ঝুলিয়ে আনবে, কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করবে না, তোমার ইলিশের দাম কত। বলা বাহুল্য, গোপাল এই বাজিতে জিতেছিলেন। কিন্তু বড় স্থূল উপায়ে। পরনের কাপড় মাথায় বেঁধে নিয়ে তিনি মাছ হাতে রওনা হলেন। কে আর তাকে তখন মাছের দাম জিজ্ঞেস করবে।

হ্যাঁ। সে একদিন ছিল বটে বাংলার জনপদে জনপদে। ইলিশ পুকুর বা খাল-বিলের মাছ নয়, বেশির ভাগ হাটেই সেটা আসত বাইরে থেকে। সেই মাছ একজোড়া কিনে কানকোতে দড়ি পরিয়ে হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরতেন হাটুরেরা, এইটাই ছিল রেওয়াজ। আর সেই আমদানি-করা মাছের দাম জিজ্ঞেস করবে না তো কী করবে। আর 'স্যার, আমার পুকুরের ইলিশ স্যার' বলে আগে বড়কর্তাকে ছোটকর্তা যে ভেট দিত, সেই রসিকতা এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু রেওয়াজটা আছে কি না দুদকের কর্মকর্তারা সেটা ভালো বলতে পারবেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের কুবেররা ইলিশ মাছই ধরত। ওই বইয়ের বর্ণনা সত্যি অপূর্ব। কিছুদিন আগেও স্কুলের পাঠ্যবইয়ে দুটো পদ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল–একটা হলো, ইলশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিম... আরেকটার শেষ লাইন–গোয়ালন্দ ঘাটে এসে, ইলিশ ধরা পড়ল শেষে। জানি না ওই দুটো আজও পাঠ্য আছে কি না।

আচ্ছা, আপনি এত কিছু থাকতে ইলিশ নিয়ে লিখছেন কেন?

কারণ, জাতে উঠতে চাই। বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি ইলিশ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, তার নামও ছিল ইলিশ:

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।

তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ উৎসব।

মোবাইল ফোন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের বদৌলতে আর গৌতম ঘোষের সিনেমায় আসাদকে দেখে আমরা সেই সব ইলিশ মাছ ধরা জেলেদের দেখেছি চৌকোনো বাক্সে। আর সম্প্রতি সরকার ইলিশ মাছ রপ্তানি ছয় মাসের জন্যে বন্ধ করে দিয়ে সব টিভি খবরের শিরোনামে পরিণত করতে পেরেছেন ইলিশকে। ওদিকে *আনন্দবাজার পত্রিকার* খবরে বলা হয়েছে, 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে বাংলাদেশের ইলিশ ও জামদানি শাড়ি আমদানি-রপ্তানির বিশেষ একটি সংবেদনশীল ভূমিকা রয়েছে।' ওই পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঙ্গি-তৎপরতা বন্ধের জন্যে কড়া কথা শুনিয়েছেন, তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে নাকি বাংলাদেশ ইলিশ রপ্তানি বন্ধ করেছে। কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে আর্জি জানিয়েছে। *আনন্দবাজারের* খবর, বিশ্বাস করবেন কি না আপনার ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত ইলিশ মাছ দিয়ে কূটনীতি। উইকিপিডিয়া বলছে, বাংলাদেশে ইলিশ দিয়ে ৫০টারও বেশি পদ রাঁধা যায়। ভাঁপা ইলিশ, ভাজা ইলিশ, ভর্তা ইলিশ, সেদ্ধ ইলিশ, পাতায় মোড়ানো ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ইলিশ মাছ দিয়ে যে কূটনৈতিক পদটা রাঁধা হচ্ছে, তার রেসিপি সিদ্দিকা কবীরও দেননি।

দেননি যে তা ভালোই করেছেন। ইলিশ কূটনীতির বিষয় নয়, সাহিত্যেরও নয়, ও এক আশ্চর্য জাদুকরি জিনিস, যার আশ্রয় রসে নয়, রসনায়। এক টুকরো ইলিশ পাতে পেলে লেখার পাতা এখানেই ওল্টানো যায়। যায় নাকি?

১০ জুলাই ২০০৭

দ্রব্যমূল্য ও 'শুয়োরের বাচ্চাদের' অর্থনীতি

এই লেখার শিরোনাম দেখে ভাববেন না যে আমি খেপেটেপে গেছি। যেমন খেপে গিয়েছিলেন সুকবি রফিক আজাদ, ১৯৭৪-এ, লিখেছিলেন, 'ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাব।' কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়েছিল, তবে কবিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমার লেখা নিষিদ্ধ হোক, এটা আমি চাই না। আমি নিশ্চয় জানি যে দেশে এখন জরুরি অবস্থা।

এই লেখার শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ–'শুয়োরের বাচ্চাদের' অর্থনীতি–ঊর্ধ্বকমা সমেত আমি উদ্ধৃত করছি আকবর আলি খানের লেখা একটা প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটি তাঁর অসাধারণ বই *পরার্থপরতার অর্থনীতিতে* ছাপা হয়েছে। বইটি অতি সুলিখিত, সুতরাং সুপাঠ্য–রম্যরচনার মতো স্বাদু। কিন্তু এর প্রতিটি ছত্রে পাই আলোর দিশা; পাই তথ্য, তত্ত্ব, গভীর ভাবনা, অগাধ পাণ্ডিত্য আর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়। বইটি এই সময়ে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে, বিশেষ করে দেশের কাণ্ডারিদের টেবিলে টেবিলে ঠাঁই পেলে ও পঠিত হলে দেশবাসী উপকৃত হবে বলে মনে করি।

বইটি অর্থনীতিবিষয়ক। কিন্তু এই আলি সাহেবের তুলনা করতে কেবল আরেকজন আলীর নামই নেওয়া যায়–সৈয়দ মুজতবা আলী। পাণ্ডিত্য আর রসবোধ একই পাত্রে তো বেশি দেখি না।

শুয়োরের বাচ্চা কথাটা আকবর আলি খান পেড়েছেন একজন ইংরেজ সাহেবের স্মৃতিকথা থেকে। আসানসোলে মহকুমা প্রশাসক ছিলেন মাইকেল ক্যারিট সাহেব। সে সময় এক পাঞ্জাবি ঠিকেদার তাঁকে বলেছিল, এই দুর্ভাগা দেশে তিন কিসিমের লোক আছে। আছেন সজ্জন, যাঁরা ঘুষ খান না; আছে বদলোক, যারা ঘুষ খায় এবং আছে শুয়োরের বাচ্চারা, যারা ঘুষ নেয় অথচ ঘুষ প্রদানকারীকে কোনো সাহায্য করে না।

আকবর আলি খানের প্রবন্ধেই উল্লিখিত হয়েছে ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের কাব্যের দুটি ছত্র, যাতে ঠিক এই ধরনের শুয়োরের বাচ্চাদের কর্মকাণ্ড ফুটে উঠেছে–

সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।

অর্থাৎ রাজস্ব কর্মকর্তা (সরকার) অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনাবাদি জমিকে কর্ষিত জমি হিসেবে চিহ্নিত করছে। যার ফলে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হচ্ছে। ধুতি ঘুষ নিয়েও সে কাজ করছে না।

এই শুয়োরের বাচ্চারা সেই আমলেও ছিল, এই আমলেও আছে। আজকের প্রসঙ্গ সেটা নয়। আজকের প্রসঙ্গ আমার লেখার শিরোনামের প্রথম অংশ– দ্রব্যমূল্য।

জিনিসপাতির দাম যে বেড়ে গেছে, সেটা *প্রথম আলোর* শিরোনাম হওয়ার আগেই সবার জানা। কারণ দেশের বেশির ভাগ লোকেরই আয় সীমিত। মাসে মাসে মানুষের আয় বাড়ে না, কিন্তু দিনে দিনে তার খরচ বাড়ছে। কাজেই দ্রব্যমূল্যের খবর খবরের কাগজে না ছাপা হলেও সাধারণ মানুষদের খবর হয়ে যায়। (আমরা অনেক সময় কথার কথা হিসেবে বলি, ভালো হইয়া যাও, নইলে খবর আছে, সেই অর্থে)।

তো, সাধারণ মানুষদের যখন খবর হয়ে গেছে, বাজারে আগুন লাগার কারণেই; তখন সরকারের খবরদারির খবরও আমাদের অজানা নয়। সরকার নানা কিছু করছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য। ব্যবসায়ীদের ডেকে পরামর্শ করছে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিবৃতি দিয়েছে: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করার জন্য এলসি খুলতে গেলে অর্থের উৎস জানতে চাওয়া হবে না। মজুদদারির বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের নেটওয়ার্ক ভেঙে দিচ্ছে যৌথ বাহিনী। বিডিআর নিজেই ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে বসেছে।

কিন্তু ফলটা কী দাঁড়াচ্ছে?

এই সরকার কেবল সেনা-সমর্থিত নয়, গণমাধ্যম-সমর্থিতও বটে। এবং জন-সমর্থিতও। আসলে জন-সমর্থনই এর বৈধতার ভিত্তি।

কিন্তু এই সরকার কোনো বিপ্লবী সরকার নয়। রাজনৈতিক সংগঠন তার পেছনে দাঁড়িয়ে নেই। '৭০ সালে সমুদ্র সমান যে জনসমর্থন আওয়ামী লীগের ছিল, '৭৪-এ তা শুকিয়ে খাল-পুকুরের তলানিতে ঠেকেছিল। মানুষের আঁতে ঘা লাগলে মুখ ফিরিয়ে নিতে তার দুদণ্ড সময় লাগে না। জিনিসের দাম না কমলে, কাজের সুযোগ না বাড়লে শুধু সংস্কারবিরোধী দুর্নীতিবাজদের শাস্তি পেতে দেখলে জনগণ বুঝ মানবে না। এই দেশের মানুষ খুব সহজেই সরকারের ওপর থেকে আস্থা হারায়। খুব অল্প সময়ে এই দেশের মানুষের মোহভঙ্গ ঘটে এবং তারা সরকারবিরোধী হয়ে ওঠে।

সুতরাং জিনিসপাতির দাম কমাতে হবে। মানুষকে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। কাজের, সৃষ্টির, এগিয়ে যাওয়ার একটা কর্মযজ্ঞ তৈরি হতে হবে। সেটা কী করে সম্ভব?

কী করে সম্ভব নয়, সেটা আগে বলে নিই। এটা বলার জন্যই আকবর আলি খানের এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গ পাড়া।

তিনি লিখেছেন, '১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন জারি হয় তখন সামরিক শাসকরা শহরাঞ্চলের নাগরিকদের খুশি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলিতে একটি বড় সমস্যা ছিল খাঁটি দুধের অভাব। দুধে পানি মেশানো হতো। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধে পানি মেশানোর কারণ হলো এই যে, খাঁটি দুধের দাম দেবার মুরোদ বেশির ভাগ ক্রেতারই নেই। ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দুধের উৎপাদন ছিল সীমিত। দুধের সরবরাহ না বাড়লে দুধের দাম বা দুধে ভেজাল কোনোটিই কমবে না, কাজেই এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমাধান হলো দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি। এ ধরনের সমাধানে সময় লাগবে, আরও লাগবে অর্থ। সামরিক শাসকরা তাই অর্থনৈতিক সমাধান উপেক্ষা করে এর রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করে। সামরিক শাসনের আগে দুধে ভেজাল দিলে বিচারক তার ইচ্ছামতো নগণ্য জরিমানা করত। সামরিক শাসকরা মনে করল জরিমানা বাড়ালেই ভেজাল দেওয়া কমে যাবে। তাই ১৯৫৯ সালে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার সর্বনিম্ন জরিমানা ১৫০ টাকাতে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫৯ সালে ১৫০ টাকা আজকের কয়েক হাজার টাকার সমান। ষাটের দশকে এই আইন প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। এ আইনের অধীনে একটি মফস্বল শহরে প্রায় শ খানেক আসামিকে আমি দেড় শ টাকা হারে জরিমানা করি। এরপর আমি আশা করেছিলাম যে, দুধে পানি মেশানো কমে যাবে। বাজার থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, এসব শাস্তির পর দুধে পানি মেশানো বেড়ে গেছে। এর কারণ হলো, আদালত কর্তৃক ভেজালের জন্য উঁচু হারে জরিমানা আরোপের ফলে বাজারে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তারা দুধ ব্যবসায়ীদের হুমকি দিতে থাকে যে তাদের ঘুষ না দিলে তারা আদালতে মামলা ঠুকে দেবে এবং আদালতে গেলেই নতুন হাকিম দুধওয়ালাদের জরিমানা করবে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ঘুষ দেওয়ার ক্ষতি পোষানোর জন্য দুধে পানি মেশানো আরও বেড়ে গেল। বিচারক হিসাবে আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম যে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছি।'

তাহলে সমস্যার সমাধান কী?

আমি অর্থনীতিবিদ নই। এই বিষয়ে নিজের কোনো মত আমি দেব না। আকবর আলি খান সাহেবের মত আমি তুলে ধরছি। 'অবাস্তব আইন বাতিল করতে হবে।

সাথে সাথে সরকারের কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। যতদিন পারমিট ও লাইসেন্স থাকবে, ততদিন দুর্নীতিও থাকবে।...কোনো জিনিসের সরবরাহ কম হলে তার দাম বাড়বে। নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলে বাজার যথাযথ মূল্যে যে কোনো পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করবে। বাজারকে অস্বীকার করলে সমস্যার সমাধান হবে না, শুধুই দুর্নীতি বাড়বে।'...'দুর্নীতি দূর করতে প্রয়োজন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। তবু দুর্নীতি নির্মূল করা সহজ হবে না। দীর্ঘস্থায়ী এ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে সরকারের আয়তন হ্রাস।'

মনে হতে পারে, যেন এই সরকারের কাজকর্ম দেখে লেখক এসব কথা লিখেছেন। সরকারের কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা ক্ষেত্রবিশেষে এখন সীমাহীন অথবা সীমানা-অচিহ্নিত।

নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে বাজারের আগুনে ঘি ঢালাই হয়। বিডিআরের একটা বাজারে কিছু জিনিস ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করলে সদিচ্ছা প্রকাশিত হয় বটে, বাস্তবে তা মরুভূমিতে এক ফোঁটা পানি ঢালার মতো। আর যৌথ বাহিনী মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করলে কেবল বাজারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিই লজ্ঘিত হয়। সমাজে প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক ভূমিকা আছে। ক্ষেতের ফসল কিনে এনে যারা গ্রামের হাটে বিক্রি করে, তারাও একটা ভূমিকা পালন করে, আবার সেখান থেকে যে ফড়েরা জিনিস কিনে গঞ্জের হাটে বেচে, তারও একটা ভূমিকা আছে। তার পেশাও একটা পেশা, তার পেটও পেট। ব্যবসা বাণিজ্য মানেই তো তাই।

সরকার ক্ষমতা নিয়েই অবৈধ হাটবাজার উচ্ছেদ করেছে, গুদামে হানা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা ভীত, তারা এলসি খুলতে ভয় পায়, পাছে তাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। যৌথ বাহিনীর লোকজন স্থানীয় পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রী-মিনিস্টার প্রমুখ যতই ব্যবসায়ীদের ডেকে কম মুনাফা করার জন্য নসিহত করবেন, ততই জিনিসের দাম বাড়বে।

আকবর আলি খান অর্থনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় তা দেখিয়েছেন। সেই সুর ধরেই বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো পুলিশি সমাধানও নেই।

দরকার অভয়ের পরিবেশ তৈরি করা। দরকার স্বাধীনতা, দরকার বাধামুক্ত পরিবেশ। ড. ইউনূসের ভাষায় বলতে হয়, পথের বাধা সরিয়ে নিন, মানুষকে এগোতে দিন। গণতন্ত্রের ১৫ বছরে এত লুটপাট, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সত্ত্বেও নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকে দেশ যে এগোতে পেরেছিল, তার একটা কারণ গণতন্ত্র নিজে, সরকারকে পাশ কাটিয়ে মানুষ তার সমস্ত সৃজনশীলতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতি শনিবারে খবর বেরুত–ভুট্টা চাষ করে

লাখপতি। এখন এই খবর দেওয়ার আগে কৃষক ভাববে, কোনো বিপদে পড়ব না তো, থানা শহরে গিয়ে দেখা করার সমন আসবে না তো!

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তার সমস্ত সৃজনশীলতা নিয়ে নির্ভীক চিত্তে, বাধাহীন এগিয়ে যেতে পারবে–এই পরিবেশ তৈরি করা এই সরকারের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

আর এই চ্যালেঞ্জের ওপর নির্ভর করছে সরকারের জনপ্রিয়তার পারদ। জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সরকারের পক্ষে তা কি বলা সম্ভব?

২৪ জুলাই ২০০৭

পাখিটা মরিল...

আজ ২২ শ্রাবণ (এই লেখা যেদিন লিখতে বসেছি)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিনে মারা গেছেন। প্রয়াণ-মহাপ্রয়াণ বললে কেমন যেন দূর-দূর লাগে। রবীন্দ্রনাথ যে মানুষই ছিলেন, খুব বড় মানুষ, একেবারে অতুল রকম বড়, তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষই ছিলেন। আর ছিলেন কবি, প্রেমিক। আর ছিলেন আমাদেরই লোক। কাজেই তিনি যখন মারা যান, মরেই গেছেন; সেটাকে প্রয়াণ-ট্রয়াণ না বললেও চলে। তাঁকে পুজোটুজো না করে তাঁর লেখা পড়লেই বোধ হয় ভদ্রলোকের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়।

কবি যে মানুষই ছিলেন, সেটাও তিনি মজা করে লিখে গেছেন 'কবি' কবিতায়:

কাব্য পড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।
ভালোবাসে ভদ্রসভায়
ভদ্রপোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্ল মুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।

সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্যমনে,
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে ঘরের কোণে।

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

আজকে তাহলে রবীন্দ্রনাথই পড়ি। তোতাকাহিনীর গল্পটা কি শোনাব? একটু সংক্ষিপ্তভাবে? খানিকটা নিজের ভাষায়, খানিকটা 'গুরুদেবের'।

এক যে ছিল পাখি। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

শিক্ষা দেওয়ার ভার পড়ল রাজার ভাগ্নেদের ওপর। পণ্ডিতেরা বললেন, খড়কুটোর বাসায় থাকে ওরা, সেখানে বেশি বিদ্যা ধরে না। কাজেই ভালো করে খাঁচা বানিয়ে দেওয়া দরকার। পণ্ডিতেরা দক্ষিণা পেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আজকের দিনেও যেমন ফেরেন আর কি!

বড় খাঁচা বানানো হলো সোনা দিয়ে। বড় বড় বই অর্ডার দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হলো নগদ টাকার বিনিময়ে। বলদ বোঝাই করে লিপিকার টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তাদের অর্থকষ্ট রইল না।

খাঁচার দেখভাল ঘষামাজার জন্যও অনেক লোক লাগল। তাদের পেছনেও কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করা হলো। তারা আর তাদের মামাতো-ফুপাতো ভাইয়েরা সবারই কপাল ফিরল।

তবু লোকজন, আজকের দিনে সংবাদপত্র যেমনটা করে আর কি, নিন্দা করতে লাগল–পাখিটার শিক্ষা হচ্ছে না মোটেও।

রাজা পরিদর্শনে এলেন। চারদিকে বিপুল বাদ্যবাজনা। তার মধ্যে পাখির মুখে বই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পোরা হচ্ছে। রাজা বললেন, শব্দ তো কম নয়। ভাগ্নে বলল, পেছনে অর্থও কম নাই।

দেখেশুনে রাজা খুশি। বললেন, নিন্দুকদের (আজকের দিনে সংবাদপত্রের) কান মলে দাও।

পাখিটা সোনার খাঁচা ঠোঁটে কেটে পালাতে চাইল তবু। তখন আরও আরও টাকা খরচ করে বানানো হলো লোহার শেকল।

রাজার সম্বন্ধীরা বলতে লাগলেন, এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।

পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, আরেক হাতে সড়কি নিয়ে এমন কাণ্ড করতে লাগলেন, যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়ল, তার গিন্নির গায়ে উঠল সোনার গয়না। আর কোতোয়াল? রাজা তার হুঁশিয়ারি দেখে তাকে দিলেন শিরোপা।

কিন্তু 'পাখিটা মরিল।'

কোনকালে কখন, কেউ ঠাওর করতে পারেনি।

নিন্দুকেরা (সংবাদপত্রই হবে) বলল, পাখি মরেছে।

রাজা বললেন, ভাগ্নে এ কী কথা শুনি।

ভাগ্নে বলল, মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হয়েছে।

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?'

ভাগ্নে কহিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'পাখিটাকে আনো দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তাহার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

৭ আগস্ট ২০০৭

কতিপয় হাস্য-কৌতুক

এত দিন বাবা গাড়ি চালাতেন। মা পাশে বসতেন। ছেলে বসত পেছনে। আজ ছেলে বড় হয়েছে। সে নিজেই গাড়ি চালাতে পারে। লাইসেন্সও পেয়ে গেছে।

ছেলে গাড়ি চালাবে। মা বললেন, ওগো, তুমি ওর পাশে বসো। আমি পেছনে বসি।

বাবা বললেন, না। আমি পেছনেই বসব।

ছেলে বলল, বাবা তুমি কেন পেছনে বসবে?

কারণ এত দিন আমি যখন গাড়ি চালাতাম, তখন তুমি পেছনে বসে আমার সিট সারাক্ষণ পা দিয়ে ঠেলতে। এবার তোমার পালা। তুমি গাড়ি চালাবে। আর আমি পা দিয়ে পেছন থেকে ঠেলব।

মাননীয় চালকেরা, চালকের আসনে যখন বসবেন, জানবেন, পেছনের যাত্রীরা সিটে ঠেলা দেবেই।

ডাক্তার বললেন, আপনার দুটো রোগ হয়েছে। খারাপটা আগে শুনবেন, নাকি ভালোটা?

খারাপটাই শুনি।

আপনার এইডস হয়েছে।

আর ভালোটা?

আপনার আলঝেইমার হয়েছে। আপনি সবকিছু দ্রুত ভুলে যাবেন।

রোগী হেসে বলল, ভাগ্যিস আমার এইডসের মতো ভয়াবহ কিছু হয়নি!

আমাদের দেশের মানুষের আলঝেইমার-জাতীয় সমস্যা আছে। তারা অতীত ভুলে যায়। বর্তমানটা মনে রাখে।

অতএব সাধু সাবধান!

একজন কাউবয় একটা পানশালায় ঢুকেছে। সে এই এলাকায় নতুন। নতুনদের খানিকটা অপদস্থ করাটা ওই এলাকার মানুষদের স্বভাব।

কাউবয় বেরিয়ে দেখল, তার ঘোড়াটা নাই।

সে ফিরে এসে ছাদের দিকে বন্দুক বাগিয়ে গুলি করে বলল, আমি এখন আরেকটা ড্রিঙ্কস নেব। সেটা খেয়ে বের হয়ে যদি দেখি আমার ঘোড়া যথাস্থানে বাঁধা নাই, আমি তা-ই করব, ডালাসে আমি যা করেছিলাম।

কাউবয় আরেক গেলাস পানীয় নিয়ে শেষ করে বেরিয়ে দেখল, ঘোড়াটা যথাস্থানে বাঁধা।

কাউবয় হাসল, একেই বলে শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

তখন একজন জিজ্ঞেস করল, ডালাসে আপনি কী করেছিলেন?

বেরিয়ে দেখি ঘোড়া নাই, হেঁটে বাড়ি গিয়েছিলাম।

সুন্দর কৌতুক। পুরোনোও। বাঙালিরা এটা জানে। ছোটবেলায় আমি সার্কাসের জোকারদের এই কৌতুক বলতে শুনেছি। বলছে, এই হাতি সর, সর, নাইলে কাইলকা যা করছিলাম, আজকাও কিন্তু তা-ই করুম। হুঁশিয়ার।

হাতি সরে না। মাহুত বলে, কাইলকা কী করছিলা?

নিজেই সইরা গেছিলাম।

বাংলাদেশে এলে এই কাউবয়কে হেঁটেই বাড়ি যেতে হবে।

এক মহিলা আরেক মহিলার সঙ্গে গল্প করছে।

জানেন, আমার কুকুরটা খুব স্মার্ট। সে রোজ সকালে বেল বাজলেই দৌড়ে দরজায় যায় আর সকালের খবরের কাগজটা এনে আমাকে দিয়ে যায়।

জানি, দ্বিতীয় মহিলা বলল।

কী করে?

আমার কুকুর রোজ জানালা দিয়ে আপনার কুকুরের কাণ্ড দেখে। সে-ই আমাকে বলেছে।

স্মার্টনেসের প্রতিযোগিতায় এক মহিলা আরেক মহিলাকে হারাতে পারবে কি না আমরা জানি না।

এক ভদ্রলোক তোতাপাখি কিনে এনে তাকে কথা বলা শেখাচ্ছেন। যত ভালো ভালো বুলিই শেখানো হোক না কেন, তোতাপাখিটা বলে, ছেড়ে দে শালা, ছেড়ে দে শালা।

ভদ্রলোক বললেন, আরেকবার যদি তুমি এই কথা বলো, তোমাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখব।

তোতাপাখি তবু বলে, ছেড়ে দে শালা।

লোকটা রেগে গিয়ে তাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখল। মিনিট পাঁচেক পর তোতাপাখিটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে আনা হলে পাখিটা বলল, আমি আর তোমাকে গালি দেব না। মুক্তিও চাইব না। বলো তো, মুরগিগুলো তোমাকে কী বলেছিল!

কী ভাই বুঝলেন তো? যদি না বোঝেন, তাহলে বিভিন্ন দেশের পুলিশের হরিণ খোঁজার কৌতুকটা আরেকবার মনে করেন।

এইবার শেষ করে দেব। ওয়াশিংটন ডিসিতে একজন যাজক গেছেন ক্ষৌরকারের কাছে। চুল কাটাতে। চুল কাটানোর পরে যাজক নাপিতকে দাম দিতে চাইলেন। নাপিত বলল, তার কাছ থেকে সে টাকা নেবে না। ধর্মের প্রতি ভক্তি থেকে সে এই কাজটা বিনি পয়সায় করে দিচ্ছে। যাজক ফিরে গিয়ে কয়েকটা ধর্মীয় পুস্তক পাঠিয়ে দিলেন উপহারস্বরূপ।

এরপর ওই দোকানে এলেন একজন শিক্ষক। তাকে বিনা পয়সায় চুল কেটে দিয়ে নাপিত বলল, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থেকে সে এই কাজটা বিনা পয়সায় করেছে। শিক্ষক ফিরে গিয়ে তাকে অনেকগুলো উৎকৃষ্ট বই পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর এলেন একজন সিনেটর। তাকেও নাপিত চুল কেটে দিয়ে বলল, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কাজের বিনিময়ে কোনো পয়সা নিতে চায় না।

সিনেটর ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

এরপর তার দোকানের সামনে সিনেটরদের লাইন পড়ে গেল। শুল্কমুক্ত গাড়ি দেওয়া হলেও সিনেটররা একই কাজ করতেন।

সব সমস্যারই কিন্তু সমাধান আছে, যদি তোমার হাতে অস্ত্র থাকে। এক খ্রিষ্টান মহিলা চান, তার মৃত স্বামীকে কবরে নামানো হোক নীল পোশাক পরিয়ে। কবরে নামানোর আগে দেখা গেল, মৃতের পরনে খয়েরি পোশাক। মহিলা আপত্তি জানালেন। সমাধিক্ষেত্রের কর্মীরা বলল, এখন আর সময় নাই। এইভাবেই চলুক। মহিলা তাতেও আপিত্ত জানালে ৫ মিনিটে সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হলো।

কী করে?

কর্মীরা বলল, পোশাক বদল করতে সময় লাগত। মাথাটা বদল করতে সময় লাগেনি। কারণ হাতে তরবারি ছিল।

আনিসুল হক: কবি, সাংবাদিক ও লেখক।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭

টুয়েন্টি-টুয়েন্টি

বিশ্ব এখন ব্যস্ত টুয়েন্টি-টুয়েন্টি নিয়ে! কয়েকটা খেলা দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ টুয়েন্টি-টুয়েন্টি, সেটাও যদি পানসে মনে হয়, তবে টুয়েল্‌ভ টুয়েল্‌ভই মনে হচ্ছে ভালো। বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০ ওভারে ১২০ পেরিয়েছে, তবু সেই খেলা দেখে মনে হচ্ছে, এ কী দেখছি। পেটায় না কেন? দুদিনেই অভ্যাস এ রকম খারাপ হয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে, পেটাও পেটাও। চার আর ছক্কা হলেই চলবে চিয়ার লিডারদের নাচ, উদ্দাম, উচ্চকিত, উচ্চনাদ বাদ্যের তালে তালে। সময় বেশি নাই, মাত্র ২০ ওভার খেলতে হবে, এর মধ্যেই শ্রীলঙ্কার মতো করে ফেলা চাই ২৬০। যে যুগের যে ভাও। এখন সবকিছুই ইনস্ট্যান্ট। অত সময় আছে নাকি যে রয়ে সয়ে সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করব। সবকিছু তৈরি থাকবে, চাওয়ার আগেই পেয়ে যাব, থালা-বাসনের কারবার নাই, সরাসরি মুখে, চিবানোর কষ্টটা তবু করতেই হয় এখনো, ভবিষ্যতে আশা করি, তাও করতে হবে না।

পৃথিবীর সবকিছু চলছে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি ফরমুলা অনুসারে। এখন সম্পর্ক টুয়েন্টি-টুয়েন্টি, দেখা হবে, কথা হবে, ভাব আর স্বার্থে বিনিময় হবে, তারপর যে যার পথে চলে যাবে, কা তব কান্তা, পৃথিবীতে কে কাহার। এখন বন্ধুত্ব হবে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি, কাল তোমাকে আমার দরকার ছিল, তাই ব্যাটে বলে বেশ জমেছিল, আজ আর দরকার নাই তোমাকে, হে বন্ধু, বিদায়। যাব বলে থেমে থাকতে নেই। প্রেমও হবে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি, ফাস্টফুডের মতো, ইনস্ট্যান্ট কফির মতো, তারপর ৪০ ওভার পর্যন্ত যদি টেকা গেল তো গেল, না গেলে চার ঘণ্টার আগেই...আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে। পালে হাওয়া লাগিবে, পোস্টমাস্টারদের মতো হৃদয়ে দার্শনিক তত্ত্বও উদিত হওয়ার কারণ নাই, কেহই বর্ষাবিস্ফারিত নদীর দিকে তাকাইয়া বলিবে না, পৃথিবীতে কে কাহার। কারণ সে আগে থেকেই জানে, পৃথিবীতে এই রূপ কত বিরহ-মিলন আছে। প্রেম একবার নয়, বারবার আসবে।

দাম্পত্যও এ রকম টুয়েন্টি-টুয়েন্টি হয়ে যাবে। তোমার পথে তুমি চলবে আমার পথে আমি। মধ্যখানে কিছুদিনের জন্যে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে যদি দেখা হয়েই যায়, দুই কাপ চা দুজনে পাশাপাশি বসে খেতেও পারি। তারপর ট্রেন এসে গেলে তোমার ব্যাকপ্যাক তোমার পিঠে, আমার ঝোলা ব্যাগ আমার কাঁধে। গতস্য শোচনা নাস্তি। সম্মুখে শান্তি পারাবার।

লেখাপড়া টুয়েন্টি-টুয়েন্টি হয়ে গেছে অনেক আগেই, অন্তত এই বাংলাদেশে। সারি সারি কোচিং সেন্টার। উত্তর লিখে দিচ্ছে শিক্ষকেরা, ছাত্ররা মুখস্থ করছে, উগরে দিচ্ছে। মূল টেক্সট কেউ পড়ছে না, গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি স্কুলের বাচ্চাদের সামনে চিল্লাচ্ছেন, তোমরা শুধু অঙ্ক কোরো না, গণিত শেখো, প্রশ্নের আগে গণিত বইয়ের প্রতিটা অধ্যায়ে কতগুলো বর্ণনা থাকে, জিনিসটা কী বুঝিয়ে বলা হয়, সেসব পড়ো, পড়ে বোঝো। কে শুনবে কার কথা। গণিতের নামে অঙ্ক। আর আছে এমসিকিউ, টিক দিয়েই পার হয়ে যাওয়া চলে পরীক্ষা নামের বৈতরণী।

রাজনীতিও হবে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি। এমনকি সংস্কারও। সবকিছু আসবে প্যাকেজে। প্যাকেজিংটা খুব দরকারি। মোড়কটা হতে হবে আকর্ষণীয়। ফয়েল পেপার, ভালো ছাপা।

বিচারও তা-ই হবে। র‍্যাব বানানো হবে। যৌথ বাহিনী অভিযান পরিচালনা করবে। ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টার। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। এই প্রক্রিয়ায় ইন্দিরা গান্ধী নকশাল দমন করেছিলেন। আমরাও পারব। পারতেই হবে।

সবকিছু হবে সীমিত ওভারের। আমাদের সাহিত্য এখন সীমিত ওভারের, বড় বড় উপন্যাস এখন আর কেউ পড়বে না, লিখবে না, উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত-সরল সংস্করণ বেরোবে, দরকার পড়লে ধ্রুপদী উপন্যাসের কমিক গিলব আমরা। আমাদের নাটক এখন সীমিত ওভারের। এক নাটকে ১০ দিন শুটিং করার সময় নাই, কদরও নাই। মনে পড়ে, সাইদুল আনাম টুটুল *নাল পিরান*-এর শুটিং করতে দুই দফায় শুধু রংপুরেই ছিলেন ১০ দিন, এর বাইরে ঢাকাতেও শুটিং হয়েছিল। এখন এক দিনে দেড় পর্ব নামাতে হবে। দেশে চলছে দৈনিক সাবান (ডেইলি সোপ)। পাণ্ডুলিপিও নাকি লিখতে হয় না। সেটে যে কয়জন শিল্পী উপস্থিত আছেন, তাঁদেরকে দিয়েই পরিচালক উপস্থিত মতো কাহিনী বানিয়ে নেন, পাত্র-পাত্রীরা সংলাপ বলতে থাকেন ইচ্ছামতো। আমাদের সাংবাদিকতাও এখন টুয়েন্টি-টুয়েন্টি। আমরা কোনো কিছুর গভীরে যাব না। আমরা টেলিভিশনে বসব লাইভ টক শো নিয়ে, দর্শক প্রশ্ন করবে, আমরা সব প্রশ্নের উত্তর জানি, ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দেব। আমাদেরও গভীরে যেতে হবে না, একটা বিষয় নিয়ে মাসের পর মাস ধরে কেঁচো খোঁড়ার সময় নাই। কোনো কিছু নিয়ে পাঁচ দিনের টেস্ট খেলব না। সময় নাই। সময় নাই। চাতক পাতক দল, চল চল চলহে।

আমরা তারকাও বানাব টুয়েন্টি-টুয়েন্টি পদ্ধতিতে। একটা জীবন সাধনা করে নিজেকে পুড়িয়ে পৃথিবীর সবকিছু ত্যাগ করে শুধুই একটা বিষয়ে সিদ্ধি অর্জন! অত সময় কই। বানাও ইনস্ট্যান্ট ফর্মুলা। ছেড়ে দাও বাজারে কিছু তারকা। নে তোরা এখন করে খা। ফরিদা পারভীন দুঃখ পাচ্ছেন, সারা জীবন গান গেয়ে কীই বা পেলাম, গান না গাইতেই গাড়ি, লক্ষ লক্ষ টাকা...

যাঁর দুঃখ তার কাছে থাকুক। আমরা এগিয়ে যাব টুয়েন্টি-টুয়েন্টি নিয়ে। উচ্চাঙ্গ সংগীত যারা গাইবেন, তাঁদের মনে এই দৃঢ়তা নিশ্চয়ই থাকবে যে ব্যান্ড তারকার মতো জলুস তারা পাবেন না।

খাও দাও ফুর্তি করো। দুনিয়া দুই দিনের। যতক্ষণ ক্রিজে আছ, বীরের মতো থাকো। যদি পেটাতে না পারো, সরে দাঁড়াও। বীরভোগ্যা এই পৃথিবী। সেই দর্শনই যেন দেখতে পাই টুয়েন্টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে।

কাজেই টুয়েন্টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ উড়ে এলেও যে জুড়েই বসবে, কোনো সন্দেহ নাই।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭

অতএব কাঁদুন

আলবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। চালাকি বা বুদ্ধিমত্তার গল্প নয়। বোকামির গল্প।

আইনস্টাইন তখন বালক। তাঁদের পোষা কবুতরের বাচ্চা হয়েছে। আইনস্টাইন বললেন, 'কবুতরের বাসাটার আরেকটা দরজা বানাতে হবে।'

'দরজা তো একটা আছেই।' তাকে বলা হলো। তিনি বললেন, 'ওটা তো বড় কবুতরের জন্যে, ছোট বাচ্চাটার জন্যে একটা ছোট দরজা লাগবে না?'

আইনস্টাইনের নাকি দুটো ছাতা ছিল। একটা তিনি অফিসে রাখতেন। একটা রাখতেন বাসায়। একবার অফিস থেকে বেরোবেন। দেখলেন বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর সহকর্মী তাঁকে বলল, 'ছাতা নিয়ে যান।'

আইনস্টাইন অনেক ভেবে বললেন, 'না, ছাতা নিলে তো হিসাবে ভুল হয়ে যাবে। বাসায় তখন দুটো ছাতা হয়ে যাবে।'

ওপরের দুটো গল্পই যে বানানো, তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে এই ঘটনাটা বানানো নয় বলেই মনে হচ্ছে। একবার আইনস্টাইন তাঁর এক বন্ধুর ১৮ মাস বয়সী বাচ্চাকে দেখে বললেন, 'হ্যালো!'

শিশুটি বিজ্ঞানীর জ্ঞানশোভিত মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আইনস্টাইন বললেন, 'আমার জীবনে এই প্রথম কাউকে দেখলাম, যে সরাসরি বলল, আমাকে দেখলে তার কী মনে হয়।'

এইটাতে মজা কম। সত্য জিনিসে মজা কমই থাকে। যেমন এই ঘটনাতেও আমরা তেমন মজা নাও পেতে পারি। আইনস্টাইনকে প্রায়ই লোকে জিজ্ঞেস করত, আপেক্ষিকতার তত্ত্বটা কী?

আইনস্টাইন একবার জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনি আপনার হাতটা এক মিনিট কোনো জ্বলন্ত চুলার ওপরে রাখেন, মনে হবে ক ঘণ্টা। আর একজন সুন্দরী মেয়ের

পাশে এক ঘণ্টা থাকুন। মনে হবে যেন এক মিনিট ছিলেন। এই হচ্ছে আপেক্ষিকতা।'

আপেক্ষিকতা নিয়ে তাঁকে প্রায়ই নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। একবার তিনি বলে ফেলেছিলেন, জিনিসটা কী তিনি আর বুঝতে পারেন না।

আইনস্টাইন তখন একটা সুইস পেটেন্ট অফিসে কেরানির চাকরি করতেন। ১৯০৫ সালের একদিন *অ্যানাল্‌স অব ফিজিক্স* পত্রিকায় তাঁর তিনটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটা ছিল আলো যে একই সঙ্গে তরঙ্গ আর কণা, তা নিয়ে। দ্বিতীয়টা ব্রাউনিয়ান মোশনের জটিলতা নিয়ে। আর তিন নম্বরটা স্থান আর কালের তত্ত্বকে খানিকটা উন্নত করা নিয়ে, যা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র হিসেবে বিখ্যাত। কেরানির চাকরি করতে করতে অবসর সময়ে তিনি এই প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন, যদি স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয়, তাহলে যেন প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়।

একদিন আইনস্টাইনের এক ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল, 'স্যার এবার পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সবই গতবারের পরীক্ষায় এসেছিল। একদম হুবহু একই প্রশ্ন।'

আইনস্টাইন বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু উত্তরগুলো সব আগের বছরের থেকে আলাদা।'

পরের গল্পটা সম্ভবত সত্য নয়।

আইনস্টাইন যখন লেকচার দিতেন, তাঁর ড্রাইভার হলের পেছনের দিকের আসনে বসে লেকচার শুনত। বারবার একই কথা শুনতে শুনতে বক্তব্য তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একদিন সে বলল, 'স্যার, আপনার ভাষণ আমার মুখস্থ। আমিই দিতে পারব।'

'তাই নাকি? আচ্ছা পরের বারই তা করা হবে।'

তাই করা হলো। ড্রাইভার বক্তব্য দিচ্ছে, আর আইনস্টাইন পেছনের সারিতে বসে শুনছেন।

ড্রাইভার বক্তব্য ভালোই দিল। এবার প্রশ্নোত্তরের পালা। একটা কঠিন প্রশ্ন এল।

ড্রাইভার হেসে বলল, 'এ তো খুব সোজা। আমার ড্রাইভারই এই প্রশ্নের উত্তর জানে।' পেছনের সিটে বসা আইনস্টাইন সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন।

আইনস্টাইনের মগজ টমাস হারভি নামের এক প্যাথলজিস্ট রেখে দিয়েছিলেন। ৪০ বছর ধরে এই মগজ কোস্টা সাইডার লেখা একটা বাক্সের মধ্যে দুটো জারে রাখা ছিল। তার কাছ থেকে সেই মগজের একটুখানি একজন গবেষক কেটে নিয়ে রেখেছিলেন তাঁর ফ্রিজে। তার পাত্রের গায়ে তিনি লিখেছিলেন: বিগ অ্যালস ব্রেইন।

আইনস্টাইনের স্ত্রী সব সময় বলতেন, 'অ্যাই, তুমি আরেকটু ভালো কাপড়চোপড় পরে যেতে পারো না?'

'কী দরকার? ওখানে তো সবাই আমাকে চেনে।'

একবার একটা নতুন জায়গায় একটা বড় কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবেন। 'এইবার তুমি একটু ভালো কাপড় পরে যাও।' স্ত্রী বললেন।

'না। কেন, ওখানে তো কেউই আমাকে চেনে না।' বললেন আইনস্টাইন।

আইনস্টাইন একবার স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, 'যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন খেয়াল করলাম, মোজা সব বড় আঙুলের কাছটাতে ছিঁড়ে যায়। সুতরাং আমি মোজা পরা ছেড়ে দিই।' আরেকবার তিনি অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'যদি আপনি মেনে নিতে পারেন, বিশ্ব হচ্ছে ক্রমাগতভাবে কিছুই না-এর দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে, এইটা একটা কিছু বটে, তাহলে কোন শার্টের সঙ্গে কোন প্যান্ট মানাচ্ছে কি মানাচ্ছে না, তাতে কিছুই যায় আসে না।'

আইনস্টাইন সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কথা বলতে শুরু করেন দেরিতে। চার বছর বয়সে। আর পড়তে শেখেন সাত বছর বয়সে।

চার বছর পর্যন্ত যখন তিনি কথা বলছিলেন না, তখন তাঁর মা-বাবা এটা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। একদিন খাবার টেবিলে মূক আইনস্টাইন বলে উঠলেন, 'সুপটা খুবই গরম।'

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এত দিন কেন কথা বলো নাই?'

'কারণ, এর আগে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল,' আইনস্টাইন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় বাক্যটি বলেন।

আইনস্টাইন আর রসায়নবিদ-রাজনীতিক ওয়েইজমেন একসঙ্গে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। জাহাজে করে। দীর্ঘ যাত্রা। প্রতিদিন আইনস্টাইনকে ওয়েইজমেন তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন।

ওয়েইজমেন বলেন, 'গন্তব্যে পৌঁছার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরিটা বুঝতেন।'

আলবার্ট আইনস্টাইনের এক সহকর্মী একদিন তাঁর কাছে তাঁর নিজের টেলিফোন নাম্বারটা চাইলেন।

আইনস্টাইন তখন টেলিফোন গাইডে নিজের নাম্বার খুঁজতে শুরু করলেন।

'তুমি তোমার নিজের টেলিফোন নাম্বারও মনে রাখতে পারো না?'

'যে জিনিসটা বইয়ে লেখা আছে, সেটা আমি মুখস্থ করতে যাব কেন?' আইনস্টাইন জবাব দিয়েছিলেন।

এই একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে আগরতলা আর জুতার তলা সমান। আমিও কোনো নাম্বার মুখস্থ রাখতে পারি না এবং যা বই খুঁজলেই পাওয়া যায়, তা মুখস্থ করে রাখি না।

আসলে আমি কোনো কিছুই মুখস্থ রাখতে পারি না। মনে হয়, আমার ব্রেনের হার্ডডিস্কে জায়গা কম।

এবং একটি সত্য ঘটনা

রাশিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান একাডেমির গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অশ্রুপাত শরীরের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। কতগুলো ইঁদুরকে কাঁদানো হয়। আর কতগুলো ইঁদুরের অশ্রুগ্রন্থি কেটে ফেলা হয়। দেখা যায়, যে ইঁদুরেরা কান্নাকাটি করেছে, তাদের ত্বকের ক্ষত অন্য ইঁদুরদের ১২ দিন আগে সেরে গেছে।

অতএব কাঁদুন। কাঁদার সময় বিলাপ না করলেও চলবে, তবে চোখের জল ফেলতেই হবে।

কাঁদা ছাড়া আমাদের উপশমের আর কোনো রাস্তা আমি দেখছি না।

৩০ অক্টোবর ২০০৭

নির্জলা মিথ্যা, নির্লজ্জ মিথ্যা

মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতার গল্প তো আপনাদের সবার জানা। বীরবলের গল্পের মধ্যে একটা এই রকম গল্প আছে।

গল্পকার বলছেন, 'আমার বাবার জন্ম হয় আমার জন্মের তিন মাস পরে।'

রাজা বলেন, 'এ আর এমন কী মিথ্যা হলো!"

গল্পকার বলেন, 'ফলের বীজ খেয়ে ফেলেছে একজন, তার মাথা দিয়ে গাছ বেরোল, সেই গাছ আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল, সেই গাছে সেই লোক নিজেই উঠে বসল।'

রাজা বলেন, 'এও তো সম্ভব।'

শেষে গল্পকার বললেন, 'বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী বলে কেউ ছিল না,

যুদ্ধাপরাধী বলে কিছু নাই।'

এইবার কেবল রাজা নন, পুরো দেশ, দেশের মানুষ একযোগে বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!'

কথাটা যে ডাহা মিথ্যা, সেটা যিনি বলেন, তিনি জানেন সবচেয়ে বেশি। যারা বলে, তারা জানে যে এ এক ডাহা মিথ্যা।

তবু বলে। কারণ গোয়েবলস সাহেব এদেরই আত্মীয়। তারা মনে করে দশবার কোনো মিথ্যা কথা বলা হলে সেটা সত্য হয়ে যায়।

হ্যাঁ। জামায়াতে ইসলামীর তাত্ত্বিক গুরু মাওলানা মওদুদির অনুপ্রেরণার উৎস কি ছিলেন হিটলার আর মুসোলিনি? তিনি তাঁদের সাফল্যের আলোকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই কায়দায় দল ও তাঁর স্বপ্নের দেশ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন!

এখন এই কথারও কি কোনো প্রতিবাদ হয়? কেউ যদি বলে যে আমার গর্ভে আমার মা জন্মেছে, তাকে আপনি মিথ্যাবাদী বলবেন। তাকে বলতে হবে পাগল। কিন্তু কেউ যদি নিজের স্বার্থে এই কথা বলে, তাকে কী বলবেন? তাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, এরাই রাজাকার বটে।

এ কথা নিজামী-মুজাহিদরাই ভালো করে জানেন যে জামায়াতে ইসলামীর সে-সময়কার ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ গঠন করেছিল আল-বদর। তাদের নেতা ছিলেন নিজামী। আর তারাই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে গেছে চোখ বেঁধে, পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে, আর তাঁদের হত্যা করে ফেলে রেখেছিল মিরপুর কি রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

সারা দেশে সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবীকে একাত্তরে হত্যা করা হয় আর এই সব হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলোর সঙ্গেই আলবদর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

শুধু একাত্তরে নয়, সম্প্রতিও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খুনের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত একই রাজনৈতিক দলের মুখচেনা নেতা।

যুদ্ধাপরাধ কাকে বলে, সেটা আইনের ব্যাপার। কিন্তু কেন জাহিদ, সুমন, শমীরা তাঁদের পিতৃহত্যার, মাতৃহত্যার বিচার পাবেন না?

আর স্বাধীনতাবিরোধী? ওরা তখনো চায়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক; এখনো বলে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল গৃহযুদ্ধ। কবি বহুদিন আগেই বলে গেছেন, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। এদের জন্ম কীভাবে, কাদের দ্বারা, কবির সন্দেহ সেই বহু বছর আগে থেকেই।

আর আছে গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের কথা। কেউ যদি গণতন্ত্রের সুফলগুলো গ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্রকেই হত্যা করে, তাকে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দিব কি না। জার্মানিতে নাৎসিদের রাজনীতি নিষিদ্ধ। যারা মনে করে, গণতন্ত্র মনুষ্যরচিত বিধান, এটা অপসারণ করে তারা তাদের নিজেদের শাসনকে চিরস্থায়ী করতে চায়–তারা কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।

হত্যাকাণ্ডের বিচার হতেই হবে। আমরা আমাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাই। আর স্বাধীনতাটাকে যারা মানতে পারে নাই, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস নারকীয় বর্বরতার প্রমাণ তো ২৫ মার্চ রাতেই সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আর এই আলবদর চক্রের বিবেককে নাড়াতে পারল না! তারা মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল। ১৬ ডিসেম্বরের পরেও তারা চালিয়ে গেল বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড! তাদের অপরাধের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে উপচে গেছে। তারা জানে, তারা দুই কান কাটা। তাই তারা এত নির্লজ্জ।

এদের বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করলেই কেবল সত্যের পথে আমাদের শুভযাত্রা নিরাপদ হবে।

৩০ অক্টোবর ২০০৭

রক্তাক্ত প্রান্তরে...

গভীর রাত। চরাচর ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল আমিই জেগে আছি। লিখছি।

লিখতে লিখতে অবসাদে ক্লান্তিতে আমার শরীর নুয়ে পড়েছিল।

আমি টেবিলে মাথা রেখে দুই হাত এলিয়ে দিয়েছিলাম।

তখনই আমার লেখার ঘরে এসেছিলেন মুনির চৌধুরী।

টুক করে শব্দ হতেই আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম সেই পাঞ্জাবি, কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, ব্যাকব্রাশ করা চুল, কিছুটা এলায়িত। তার গলার কাছের বোতামটা খোলা ছিল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তাঁকে সালাম দিলাম। বললাম, স্যার, আপনি বসুন।

তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, তুমি আমাকে চেনো!

আমি বললাম, আপনাকে আমি চিনেছি। ছবিতে দেখেছি। যদিও আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তিনি বললেন, আমার কোনো লেখা তুমি পড়েছ?

আমি বললাম, আপনার লেখা রক্তাক্ত প্রান্তর আমাদের পাঠ্য ছিল। ওটা প্রায় সবারই পড়া আছে।

আর কিছু?

স্যার আপনার জন্য লেখাও টুকরো-টাকরা পড়ার সুযোগ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ সন্ধ্যায় বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র প্রকাশিত রমণীয় রচনা নামের রম্য বা বৈঠকী রচনার বইটি ওল্টাতে ওল্টাতে আপনার লেখা পড়ছিলাম।

ওরা কোন লেখাটা নিয়েছে?

চোর স্যার লেখাটার নাম।

তিনি মৃদু হাসলেন।

স্যার দ্বিতীয় খণ্ডে ওরা নিয়েছে আসুন চুরি করি! নামের প্রবন্ধটা।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, অনেক আগে লেখা। একটু অতিশয়োক্তি বোধ হয় করে থাকব।

আর স্যার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের স্মৃতিকথায় আপনার একটা বক্তৃতা পুরো উদ্ধৃত করা আছে, সেটাও পড়ার সুযোগ হয়েছে।

তিনি মৃদু হাসলেন।

আমি বললাম, স্যার। আপনি নাকি খুব ভালো আবৃত্তি করতেন। গুণদা (নির্মলেন্দুগুণ) তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, আচ্ছা একটু স্যার, আমি শেলফ থেকে নির্মলেন্দু গুণের বই বের করে পড়ে শোনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজন করে 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'র এক আশ্চর্য সফল অনুষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ঐ অনুষ্ঠানটি হয় ১৪ মে ১৯৬৮।

ঐ অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুনীর চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। মুনীর স্যার যে কত বড় আবৃত্তিকার ছিলেন, তা আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম। শামসুর রাহমানের দুঃখ কবিতাটি সেদিন আমার কাছে নতুনভাবে আবিস্কৃত হয়েছিল। হলভর্তি শ্রোতার পিনপতন নীরবতার মধ্যে মুনীর স্যারের আবৃত্তি শুনে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আহা, এমন দিন কি কখনও আসবে, যেদিন মুনীর স্যার আমার কোনো কবিতা এ রকম কোনো অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবেন?

শুনে মুনীর চৌধুরী মৃদু হাসলেন।

আমি শেলফ থেকে আনিসুজ্জামান স্যারের লেখা মুনীর চৌধুরী বইটা বের করলাম।

বললাম, আনিসুজ্জামান স্যার আপনার ব্যক্তিজীবন নিয়ে তার লেখাটা শেষ করেছেন কী করে, দেখেন।

"নীলক্ষেতের ফ্লাটে প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিলাম আমি। প্রায় রোজই মিশুককে স্কুলে পৌঁছে তিনি চলে আসতেন আমার বাসায়। কোনোদিন আমি তখন ঘুম থেকে উঠেছি কোনোদিন উঠেছি তাঁর গলা শুনে। খাওয়ার টেবিলে বসে রুটিতে মাখন লাগিয়ে এগিয়ে দিতেন আমাদের দিকে। নিজে খেতেন শুধু এক কাপ চা। চা-ও ঢেলে দিতেন প্রায় দিন। খুচরো কথায় হাসির ঢেউ তুলতেন। এও তাঁর আনন্দের অংশ ছিল।

আমার বিদায়-সভায় তাঁর এই প্রাত্যহিক অভ্যাসের উল্লেখ করে বলেছিলেন তিনি: "এখন প্রতিদিন আটটা বাজবে, নটা বাজবে, এগারোটা বাজবে আনিসের সঙ্গে দেখা হবে না।" তখন কি জানতেন যে আমার জন্যে এমন সময়ও আসবে, যখন

দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে, তবু তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না– কোনোদিনও না।

শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, আনিস (আনিসুজ্জামান) কেমন আছে!

বললাম, ভালো আছেন। সতেজ আছেন। কারাবন্দি শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাগজে ছবি দেখলাম। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব তাই নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তিনিও মনে হয় যোগ দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি চুপ করে রইলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ থেকে বিড়বিড় করে বললেন, এখনও গেল না আঁধার।

তিনি বললেন, খবর কি আছে কিছু রক্তাক্ত প্রান্তরে!

আমি বললাম, আরে তাই ত, এই রকম একটা শামসুর রাহমানের কবিতা আছে আপনাকে নিয়ে।

"শুনুন মুনীর ভাই, খবর শুনুন বলে আজ
ছুটে যাই দিগ্বিদিক, কিন্তু কই কোথাও দেখি না আপনাকে।
খুঁজছি ডাইনে বাঁয়ে, তন্ন তন্ন, সবদিকে, ডাকি
প্রাণপণে বার বার। কোথাও আপনি নেই আর।

আপনি নিজেই আজ কী দুঃসহ বিষণ্ন সংবাদ।"

তিনি বললেন, আমার খবর না, তোমাদের খবর বলো।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমি কী বলব। এই শিক্ষক সাহিত্যিক নাট্যকার মানুষটিকে ১৪ই ডিসেম্বর ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রকম অনেককেই। যারা নিয়ে যায়, আলবদর বাহিনীর লোকেরা, তারা তো বাঙালিই ছিল।

মোহাম্মদপুর ফিজিকাল ট্রেনিং সেন্টারে অত্যাচার করা হয় এদের ওপরে।

পিঠমোড়া করে হাত-বাঁধা, চোখ বাঁধা এদের দেহ পড়ে ছিল রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো।

কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হলো কই!

আর বুদ্ধিজীবী হত্যার মিছিলই বা থামল কোথায়?

এই তো গত কয়েক বছরে হত্যা করা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ইউনূস, অধ্যাপক তাহেরকে।

হুমায়ুন আজাদের হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, শামসুর রাহমানকে তারাই মারতে গিয়েছিল। এ ছাড়া কবির চৌধুরী, তসলিমা নাসরিন...

প্রমুখকে হত্যা করার পরিকল্পনা তাদের ছিল। অথচ এই মুফতি হান্নান সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্রয়ধন্য ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুজনকে যারা হত্যা করেছে, তাদের বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করার আয়োজন নেই।

কিন্তু মৌন মিছিল করার অপরাধে শিক্ষকদের সাজা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আশার কথা, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে বলে খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে।

এইসব খবর আমি তাকে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না।

আমি বরং পাঠ করতে পারি উচ্চ মাধ্যমিকে পড়া রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে: হয়তো এমন এক সময়ে এসে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে যখন রক্তের বন্যায় এই প্রান্তর ডুবে গেছে। ঢেউয়ের দোলায় আমি কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতবার চোখ খুলতে চাইছি ততবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ইব্রাহিম কার্দির এই আর্তি বাংলাদেশে আর কতবার সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

ভাবছি। নিজেকেই প্রশ্ন করছি। মাথা ঘুরে তার দিকে তাকাই। তিনি নেই।

রূপ লাগি

নায়িকা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। রূপমাধুরী পত্রিকার সম্পাদিকা তাবাসসুম আরা নিজে এসেছেন সাক্ষাৎকার নিতে। আপনার রূপের গোপন রহস্যটা কি জানাবেন? কতদিন থেকে এই মহিলা পেছনে লেগে আছেন। কত আর না করা যায়। নাছোড়বান্দাকে পিছছাড়া করার সহজ উপায় হলো সে যা চায় তা দিয়ে দেওয়া। আজ তাই নায়িকা তাকে জানাচ্ছেন তার রূপের গোপন রহস্য।

তাবাসসুম আরা বসে আছেন ডিভানে। আর নায়িকা মেঝেতে, তার চারদিকে নানা আকৃতির বালিশ। কুশন বলাটাই বোধহয় দস্তুর। নায়িকার কোলে একটা টেডি বিয়ার।

তাবাসসুম আরা ক্যাসেট পেয়ার অন করলেন। কেশে নিলেন একটু । তারপর বললেন, ম্যাডাম, আপনার হাসিটা কী বলব ভুবনমোহিনী। আপনি যে শোবিজে আজ শীর্ষস্থানে চলে এসেছেন, তার পেছনে রয়েছে আপনার এই হাসির ম্যাজিক। এটাকে ঠিক মোনালিসার হাসির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। মোনালিসার হাসি তো বিচ্ছিরি, কী বলেন। মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে খানিকটা তুলনা চলে হয়তো। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার হাসির রহস্যটা কী? আপনি দাঁত সুন্দর রাখার জন্যে কী করেন। একটু টিপস দেন না আমার পাঠকের জন্যে।

নায়িকা কাশেন। কেশে গলা পরিষ্কার করে নেন। নায়িকার জন্ম খুলনার গ্রামে। অজপাড়াগাঁয়ে। বাবা ছিলেন সুপুরির ব্যবসায়ী। তিনি বাপ-মায়ের ছোট মেয়ে।

নায়িকা ছোটবেলায় কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতেন। সকালবেলা উঠে সোজা চলে যেতেন উঠানের কোণে, চুলার ধারে। কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকত। আধাপোড়া কোনো চ্যালা কাঠ তুলে কুকুরটাকে তাড়াতে হতো। তারপর ওই কাঠের গা থেকেই একটা খণ্ড কয়লা তুলে নিয়ে দাঁতের নিচে ফেলতে হতো। কুড়কুড় কামড়ে কয়লা গুঁড়ো হতো। হয়ে উঠত উৎকৃষ্ট মাজন। বাঁশের কয়লায় দাঁত মাজা হতো সবচেয়ে ভালো। বেশ নরম হয় সেটা। তবে মাঝেমধ্যে টুথপাউডারও যে বাড়িতে আসত না

তা বলা যাবে না। লবণের সঙ্গে সর্ষের তেল ছিল বিশেষ উপকারী। দাঁতের দাগ তো দাগ, এনামেল পর্যন্ত উঠিয়ে ছাড়ত। দাঁত মেজে কুয়োর পাড়ে গিয়ে দড়ি নামিয়ে বালতিতে জল টেনে তুলতে হতো। কুলি করে তর্জনী ঢুকিয়ে দাঁতে ঘষতেই কিচিরমিচির। পাখির ডাক। মানে দাঁত পরিষ্কার হয়েছে। এসব কথা কি বলা যাবে সাক্ষাৎকারে? বলা সঙ্গত?

নায়িকা বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমার একটা শখ টুথপেস্ট সংগ্রহ করা। কত ধরনের কত দেশের টুথপেস্ট যে আমার কাছে আছে। তবে আমি কিন্তু একটা জিনিসই দেখি, ফ্লুরাইডটা ঠিকমতো আছে কি না। ব্রাশের ব্যাপারে আমি ভীষণ খুঁতখুঁতে। এই একটা ব্যাপারে আমি মোটেও দেশপ্রেমিক নই। আমার টুথব্রাশটা বিদেশী হতেই হবে।

ম্যাডাম, কোন ব্রান্ডের এটা বলা যাবে?

ব্রান্ড, না ব্রান্ড বলতে চাই না। বোঝেনই তো একটা কোম্পানির সঙ্গে অ্যাডের চুক্তি হচ্ছে। বলার দরকার নাই।

ম্যাডাম, স্বীকার করতেই হবে, আপনার চুল। এই রকম চুল আমি আর কোনো নায়িকা কি গায়িকা, না কারো সঙ্গেই তুলনা চলে না। আপনি চুলের যত্ন কীভাবে নেন?

নায়িকা উদাস হয়ে যান। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। চুলের যত্ন? মাথাভরা ছিল উঁকুন। প্রত্যেক গ্রীষ্মে মা বাধ্যতামূলকভাবে মাথা দিতেন ন্যাড়া করে। সুশীল নামে এক নাপিত আসত। আমগাছের ছায়ায় পিঁড়িতে বসে চলত গণচুলকাটা। সুশীলের হাঁটুর ওপরে মাথা রাখতে হতো। আর তেল-পানি-সাবান কি জোটেনি? নিশ্চয়ই। প্রথমে দেওয়া হতো সর্ষের তেল। খাঁটি ছিল তা, সেটা হয়তো বড়মুখ করে বলা যায়। মাথায় তেল দিয়ে শাড়ির পাড় ছেঁড়া ফিতা দিয়ে টাইট করে চুল বেঁধে নিলে তবে শুতে যাওয়ার অনুমতি মিলত। কিছুটা বড় হলে সর্ষের তেল বর্জন আন্দোলনে অংশ নেওয়া। আন্দোলন জয়যুক্ত হলে প্রমোশন। নারকেল তেল। আর প্রত্যেক সপ্তাহে মাথায় সাবান দেওয়া হতো। তিব্বত, লাইফবয়, লাক্স। যখন যেটা জুটত। শ্যাম্পু তাদের ছোটবেলায় এত জনপ্রিয় আর এত সস্তা হয়নি। খুলনার ওই গ্রামে শ্যাম্পু কেউ চিনত না।

চুলের ব্যাপারে না আমি অরগানিক...একটু দই দিই...সপ্তাহে এক দিন মেহেদি...তারপর ডাবের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলি... মসুরের ডালেও কাজ হয় ভালো। বেটে নেবেন আগের রাতে। ঠিক বলছি তো। এইসব মাথায় দেয় তো? হ্যাঁ। এখন

শ্যাম্পুই করেন তিনি। সপ্তাহে দুইবার। বিদেশীই। আর কন্ডিশনার। বলার দরকার কী? ডিম দিই বললেই তো হয়!

চোখ? আপনাকে নিয়ে জীবনানন্দ দাশ একটা কবিতা লিখেছেন। চুল তার কবেকার বিদিশার অন্ধকার নিশা...পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। আপনার এই চোখ...চোখের যত্ন নেন কীভাবে?

চোখের যত্ন না? বলবে নাকি। দাদি খুব ভালো কাজল বানাতে পারতেন। ল্যাম্পোর ওপরে সর্ষের তেলমাখা পিরিচ ধরে রাখলেই কাজল হয়ে যেত। সেই কাজল দুই চোখে ধ্যাবড়া করে মেখে একটা টিপ পরে ঘুরে বেড়ানো পাড়াময়। মাথায় তেল জবজব করছে। সেই তেল গায়ে-পায়ে-মুখে একটা চকচকে ভাব এনে দিয়েছে। কী গৌরবেই না ঘোরা চলছে সারা পাড়া।

ত্বকের যত্নে? ত্বক, না? ত্বকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টান্ট। ছোটবেলায় খুব ঘা হতো। পা ভরা ঘায়ের দাগ। ভাগ্যি বাংলাদেশে স্কার্টটা জনপ্রিয় হলো না। নইলে তো নির্ঘাত ধরা। এই ঠ্যাঙ কি আর বের করার মতো নাকি। আজকালকার নায়িকাগুলো যে হাফপ্যান্ট হটপ্যান্ট পরছে, এটা তার দু চোখের বিষ। বাঙালি নারীর সৌন্দর্য হলো তার শালীনতাবোধ।

নায়িকা এইসব ভাবছেন। মুখে কত কী বলছেন। সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে বেরই হন না। ডাবের পানি দিয়ে সকালে মুখটা ধুয়ে নেন। মাঝেমধ্যে দুধের সর। হলুদবাটা সপ্তাহে একবার। উপটান...ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম... শোবার আগে ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে...সারা দিন শুটিং থাকে...ত্বক পুড়ে যায়...

মেকাপ? হ্যাঁ। আমার মেকাপের ব্যাপারে আমি একদম যাকে বলে...সবটা আসে প্যারিস থেকে...আমার মেকাপম্যান আছে নিজস্ব...কথাটায় খানিকটা সত্যতা আছে। সিনেমার মেকাপ নিতে নিতে, বাজে মেকাপ সব, তার মুখমণ্ডল পুড়ে গেছে। এখন যদি তিনি মেকাপ ছাড়া এই মহিলার সামনে আসেন, তিনি আঁতকে উঠবেন। নানা জায়গায় দেখিয়েছেন নায়িকা। ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর...না ভালো আর হচ্ছে না। এখন বিদেশী মেকাপ ব্যবহার করেন ঠিকই কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। তবে ছোটবেলায় ত্বকের এত যত্নআত্তির ব্যাপার ছিল না। বাসায় স্নো আসত। পাউডার আসত। সেইসবই মাখা চলত পাল্লা দিয়ে। ঘামাচি হতো খুব গরমের দিনে। পিঠ ভরে পাউডার ছিটিয়ে মাদুর নিয়ে আমগাছটার ছায়ায় শুয়ে পড়ে হাতপাখা নাড়া চলছে। পাশেই রেডিও। রকমারি গানের অনুষ্ঠান গীতালি কি অনুরোধের আসর গানের ডালি চলছে। এই পৃথিবীর পরে কত ফুল ফোটে আর ঝরে...গানের ফাঁকে

ফাঁকে বিজ্ঞাপন... গ্রাইপ ওয়াটারের... আলকাতরার... সেইসব কথা কি বলা যায়? বলা যায় না। ভোলাও যায় না। নস্টালজিক লাগে নিজেকে।

আপনার ডায়েট নিয়ে যদি কিছু বলেন?

ছোটবেলা থেকেই এই ব্যাপারে আমি সচেতন। কম খাওয়া। পরিমিত খাওয়া। তবে টাটকা ভেজালমুক্ত জিনিস খাওয়া। এই একটা কথা নায়িকা ঠিক বললেন। এতগুলো ভাইবোনের সংসার। বেশি খেতে চাইলেই কি পেতেন নাকি! তবে নিজের বাড়িতে গরু ছিল। দুধ হতো প্রচুর। খাঁটি দুধ, খাঁটি ঘি। তাদের গাছের ডালে, ঘরের কড়িবর্গায় মৌমাছি চাক বাঁধত। মধু নামত চাকভাঙা। শাকসবজি, ফলমূল সব খাঁটি। সব টাটকা। মাছ আসত নদী থেকে। আজকের মতো ফরমালিন দেওয়া মাছ নয়। গাছের আম। গাছের জাম। গাছের কুল। মাচাভরা লাউ। রান্নাঘরের খড়ের চালে চালকুমড়া। ইস। কী আনন্দভরা শৈশবই না ছিল। সাঁতার শিখেছেন নদীতে। জংলি ফুলের গাছ থেকে ফুল তুলে সরাসরি মধু টেনে খেয়েছেন কত। ঘরের পিঁড়ালি জুড়ে টকপাতার গাছ। সেসব খেয়েছেন। সেসব দিয়ে খেলেছেন। দস্যিপনা করতে গিয়ে হাত-পা কাটা যেত প্রায়ই। দূর্বাঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিলেই ব্যস। অ্যান্টিসেপটিক। পুঁইশাকের বিচি দিয়ে কী সুন্দর রঙ হতো। হাত-পা রাঙাতেন তাই দিয়ে।

কোথা থেকে তার জীবনটা কী হয়ে গেল। শহরে গেলেন বড় আপার বাসায়। হাইস্কুলে ভর্তি হতে। সেখান থেকে একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে ছবি পাঠানো। ছোটবেলায় খুব সর্দি হতো। সারাক্ষণ নাকের নিচে ঝুলে থাকত সর্দি। তাকে ডাকা হতো সিকনি নামে।

সেই সিকনি আজ নায়িকা। সুন্দরীদের আইডল। কত কথা বলতে হচ্ছে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে। তবে একটা জিনিস এখনো অকৃত্রিমই আছে তার। হাসিটা। দুটো দাঁত অবশ্য নকল। রাতের বেলা দাঁত খুলে শুতে যান। সকালে দাঁত মেজে তারপর পরে নেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে, গ্রামের সেই অকৃত্রিমতার দিনগুলো থেকে একটা জিনিস তিনি সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন। তার সহজ-সরল গ্রাম্য হাসি। সেই হাসিটা দিয়েই তিনি বাজিমাত করে চলেছেন। লোকে বলে, তার হাসির সঙ্গে নাকি চোখও হাসে। লোকে আরো কত কী বলে।

আচ্ছা বাচ্চাদের জন্য আপনি যে কাজ করছেন, বিশেষ করে এতিম শিশুদের জন্য, এ নিয়ে কিছু বলেন।

আসলে আমরা যারা সেলিব্রেটি, সমাজের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়ে গেছে। আমরা হয়তো অতটা সময় দিতে পারি না বা অনেক টাকাপয়সা খরচ করতেও পারি না। কিন্তু আমাদের আন্তরিকতা যদি থাকে, তাহলে তাতে অনেক কাজ

হয়। বিশেষ করে আমাদের দর্শকরা কিন্তু এটাকে ফলো করে। ফলে তারাও এই ধরনের ভালো কাজে এগিয়ে আসে। আমি তাই এই কাজগুলো খুব আন্তরিকভাবেই করি।

এই কথাটা তিনি সত্য বললেন। তার একটা বিয়ে হয়েছিল। সেই পক্ষের একটা ছেলেও ছিল। বাচ্চার বাবা অপঘাতে মারা গেছেন। ছেলেটাকে তিনি এতিমখানায় দিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটা সাফল্যের পেছনে আছে বড় ধরনের আত্মত্যাগের ইতিহাস। কারো না কারো স্যাক্রিফাইস। তার ক্ষেত্রে এই স্যাক্রিফাইসটা অন্য কেউ করেনি। তারনিজেকেই করতে হয়েছে।

১৪ এপ্রিল ২০০৫

ভালো থাকিস বাবা

রাস্তা পার হচ্ছিলাম, রাত ১০টায়, রাতটা একটু বেশি হয়ে গেছে, একটু বেশি বেশি, পঙ্গু হাসপাতালে নান্টু মামাকে দেখাটা না সারলেই হচ্ছিল না, এই দিকটাতেই এসেছিলাম অফিসের সহকর্মীর বিয়ের দাওয়াত খেতে, হাসপাতালের এত কাছে কমিউনিটি সেন্টারটা যে, তাকে না দেখে ফেরাটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না, নান্টু মামাকে দেখে খুব খারাপ লাগল, কী শুকিয়ে গেছেন, হাড় জিরজির করছে, মেঝেতে মামী শুয়ে আছে কাঁথা গায়ে, আমাকে দেখেও উঠল না, অন্যমনস্ক ছিলাম, ব্যস, কোত্থেকে কী একটা যান, মিনিবাসই হবে, আমাকে জোরে ধাক্কা মারল, আর আমার শরীরটা ছিটকে পড়ল আরেক দিকে, আমার শরীর থেকে আমার চেতনাটা বেরিয়ে এসে একটা গগনশিরীষ গাছের ডালে লটকে রইল। না, আমি মরিনি। যা সংজ্ঞা হারানো, কেবল তা-ই হয়েছে। আমি, বেশ দুঃখজনক মজার ব্যাপার যে, নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে নিজের অবস্থাটা বিচার করতে পারছি।

আমার শরীরটা পড়ে আছে, কাত হয়ে, মাথার পেছনটা থেঁতলানো, লম্বা চুলে ধুলা আর রক্ত মেখে আছে, শাড়ি উঠে গেছে পা থেকে, সায়া বেরিয়ে আছে, আঁচল লুটাচ্ছে ধুলায়, শরীরটা আমার পড়েই আছে। পড়েই আছে। মাথার ওপরে সোডিয়াম আলো, ঈষৎ কুয়াশা, ফুলের রেণুর মতো আলো। শীতের রাত বলেই বোধহয় রাস্তাঘাট বেশ নির্জন। তবু গাড়লের মতো কেশে বাস-মিনিবাস চলছে, স্কুটারগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে আমার শরীরটা, কেউ এসে একটু থামছে না, কে আর আজাইড়া ঝক্কি নিতে চায়। আমার শরীরের ভেতরে হৃৎপিণ্ড চলছে, ফুসফুস দম নিচ্ছে, বুকের ওঠানামা, দূর থেকেও টের পাওয়া যায় কি যায় না।

কেউ আমাকে তুলবে না? নেবে না আমাকে হাসপাতালে?

আমার ছেলেটা বাসায় অপেক্ষা করে আছে, কখন আমি ফিরব। কী করছে সে এখন?

শরীরটা এইখানে পড়ে আছে, মিনিট যাচ্ছে, ঘণ্টাও বুঝি যায় যায়, ততক্ষণে

আমি একটু আমার ছেলে, আমার জান, আমার সর্বস্ব টুটুলকে দেখে আসি।

বেইলি রোডের সরকারি কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম। আমি আর টুটুল। আমি সরকারি চাকুরে, সহকারী সচিব, আর আমার স্বামীও মারা গেছেন অকালে। হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখে। তার অনেক সয়সম্পত্তি ছিল, ব্যাংকে টাকা, সেসবের উত্তরাধিকারী সবই টুটুল। আমি তার বৈধ অভিভাবক আর মা। আমিই টাকা-পয়সার নজরদারি করতাম। বাসায় একজন জমিলার মা আছে। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে তাকে, সম্পর্কে আমার ফুফুই হয়। তবু তাকে জমিলার মা বলেই ডাকি। আপনি না বলে তুমি বলি। আমাদের সরকারি চাকরির শিক্ষা: কাজের লোককে অর্ডার করলে অর্ডারের মতো করেই করবে।

টুটুল পড়ে ক্লাস সিক্সে। ওর বাবা যখন মারা যায় তখন ওর বয়স ৭। বুদ্ধিমান ছেলে। মৃত্যু কী, তখনই বুঝত। কিন্তু আমার সামনে কোনো দিন কাঁদেনি। ও কাঁদত লুকিয়ে।

টুটুল টেলিভিশনের সামনে বসে। রিমোট হাতে চ্যানেল পাল্টাচ্ছে। কার্টুন চ্যানেলে গিয়ে থামল। দেখছে। দেখুক। আহা রে বাচ্চাটা। বারো পার হয়ে তেরোর দিকে যাচ্ছে। এখনো হাঁ করে কার্টুন দেখে।

জমিলার মা উঁকি দিল: ভাত খাইবা না? আহো।

না। মা আসুক।

মা কখন আহে ঠিক আছে? কত রাইত না-খাইয়া থাকবা? হে তো বিয়ার দাওয়াত খাইয়া ঢেকুর তুলতেছে।

আমার অনুপস্থিতিতে জমিলার মা এই সুরে কথা বলে নাকি!

টুটুল টিভি থেকে মুখ সরাচ্ছে না। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে যা হোক। মা আসছে না, সাড়ে ১০টা বাজে, তার মুখ দেখেই বোঝাচ্ছে সে উদ্বিগ্ন, কিন্তু সেটা সে মুখে বলবে না। আহা রে বেচারা। এত রাত পর্যন্ত না-খেয়ে আছে। কিন্তু ওকে তো বলতেও পারছি না, বাবা খেয়ে নাও। আমি তো এখন মানুষের সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের ঊর্ধ্বে। আমার শরীর পড়ে আছে রাস্তায়। কেউ সেটার ধারে কাছে ভিড়ছে না।

টুটুল কি সারা রাত না-খেয়েই থাকবে? সারা রাত এইভাবে বসে টিভিই দেখবে? বাবা টুটুল, তোমার মা অ্যাকসিডেন্ট করেছেন, তুমি খবর নাও। লোকদের বলো মাকে হাসপাতালে নিতে! না, কিছুতেই কারো কাছে পৌঁছাতে পারছি না।

আমি আবার চলে আসি রাস্তায়। মুহূর্তে। আমার শরীরটা ঘিরে এরই মধ্যে একটা জটলা দলা পাকাচ্ছে। এইবার বোধহয় কেউ একটা ব্যবস্থা করবে। এগিয়ে এল একটা স্কুটারওয়ালা। ভিড় ঠেলে সে বলল, অ্যাকসিডেন্ট কইরা পইড়া আছে। এনারে হাসপাতালে লইতে হইব।

ওরা একটা ট্যাক্সি খুঁজছে। পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা পুলিশের গাড়ি এসে জুটেছে। জনতা তাতেই তুলে দিচ্ছে আমার শরীর।

এরই মধ্যে আমার ভ্যানিটি ব্যাগ আর গলার চেইনটা হাওয়া হয়ে গেছে।

না, কোনো বেঞ্চে আমার শরীরটার জায়গা হলো না। আমাকে পুলিশের ভ্যানের মেঝেতেই শুইয়ে রাখা হলো।

ভ্যান চলছে।

আমাকে আনা হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে। পুলিশের লোকেরা নেমে একটা ট্রলি জোগাড়ের চেষ্টা করছে। রাত ১১টা।

ট্রলি পাওয়া গেছে। কোনো ব্রাদার পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের লোকেরাই আমার শরীরটা টেনে তুলল ট্রলিতে। তারপর নিয়ে গেল জরুরি বিভাগে।

কিছুক্ষণ শরীরটা ট্রলিতেই থাকল। কে নামাবে। খানিকক্ষণ পরে কারো বুঝি ট্রলির দরকার পড়ল। আমার শরীরটা দুইজনে ধরে নামিয়ে রাখল শানের মেঝেতে।

আরে আমি তো এখনো মরিনি। আমি তো এখনো লাশ হইনি। কেবল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছি। আমার চেতনা আমার শরীর ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেই এই অযত্ন, এই অবহেলা।

আমার টুটুল কি এখনো খায়নি? এখনো ঘুমায়নি?

থাকুক আমার দেহ এইখানে মেঝেতে পড়ে। কোনো ডাক্তার এসে না-ধরুক কব্জি, তবু আমি একটু ঘুরে আসি আমার ছেলেটার কাছ থেকে।

বেচারা।

টুটুল উদ্বিগ্ন মুখে গেল রান্নাঘরের পেছনের বারান্দায়। ঘেরা এই বারান্দাতেই জমিলার মা থাকে। সে এরই মধ্যে খেয়েদেয়ে মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়েছে।

জমিলার মা, মা যে এখনো এল না। টুটুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে হতাশ কণ্ঠে বলল।

জমিলার মার সাড়া নাই। টুটুল আবার বলল।

জমিলার মা উঠে বসল।

তোমারে এত কইরা কইলাম খায়া লও।

আমার মার জন্যে খারাপ লাগছে। টুটুল কেঁদে ফেলল।

অ। কয়টা বাজে।

বারোটা।

অহনও আসে নাই?

না।

তাইলে তো ভাবনার কথা।

জমিলার মা উঠে বসল।

আহা বাবা টুটুল। আগে খেয়ে নাও। তোমার মা কি আর রাতে ফিরতে পারবে? সে তো শুয়ে আছে মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের বারান্দায়। এখনো কোনো

ডাক্তার তাকে দেখেনওনি। বিড়বিড় করি। কিন্তু এ কথা টুটুলের কানে পৌঁছায় না।

টুটুল হাউমাউ করে কাঁদছে।

জমিলার মা বলে, আহা, কানতে বইলেন ক্যান। মা আর কী করে? সারাটা দিন তো থাকে অফিসে। সকালে বাইরায়। সানঝের বেলা আহে। আমিই তো করি সব। স্কুল থাইকা নিয়া পর্যন্ত আইছি হেই হেদিনও। আইব। বিয়াশাদি, দেরি তো হইতেই পারে। দামান্দ আইতে দেরি করে। আমগো গেরামে কত দেখছি ফজরের আজান হইতেছে আর বিয়া পড়ানো শুরু হইল। আহো। বহো। খায়া লও।

যাক ছেলেটা খেতে বসেছে। একটুখানি শীতল হয় জানটা।

জমিলার মা তরকারিটা গরম করে দিতে পারল না। ঠাণ্ডা ভাত ঠাণ্ডা তরকারি টুটুল খেতে পারে!

না, সে খেতে পারছে না। তার গলা দিয়ে যে ভাত নামছে না সেটা বোঝার জন্যে মায়ের চোখও দরকার নাই। ভাতের থালা সামনে নিয়ে সে কাঁদছে।

মেডিকেল অফিসার আমার বডির কাছে এসেছেন। এই, এই পেশেন্ট কে রেখে গেল?

পুলিশের গাড়ি নামায়া দিয়া গেছে। একজন বলল।

কী কেস?

মনে হয় রোড অ্যাকসিডেন্ট।

নামধাম দিয়া গেছে কিছু?

না। আনআইডেন্টিফায়েড।

এহ্। মাথার পেছনে তো ভালো চোট পাইছে। ব্রেন ইনজুরি মনে হয়। সিটি স্ক্যান করা দরকার।

এই হসপিটালে তো ব্যবস্থা নাই।

কোনো অ্যাটেনডেন্ট আসে নাই রোগীর?

না, কেউ তো নাই। কী করবেন?

কী আর করবা। কিছুই করার নাই। কালকা সকাল পর্যন্ত টিকলে হয়। স্যার এসে দেখে যা করার করবে।

ডাক্তার আরেক রোগীর দিকে যায়। একটা পা-ভাঙা কেস এসেছে। রোগীটা বড় চেঁচাচ্ছে। ওইটারে একটা ইনজেকশন দেন তো সিস্টার, সিস্টার...

টুটুল আর জমিলা বাসা থেকে বেরিয়েছে। সামনের ফ্ল্যাটে গেল। হামিদুজ্জামান সাহেবের বাসা এটা। দোরঘণ্টি বাজাল। ভেতরে পাখি ডাকার মতো করে ঘণ্টি বেজে চলেছে।

কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।

আবার বোতাম টিপল টুটুল।

অনেকক্ষণ পরে ভেতর থেকে আওয়াজ এল: কে? হামিদ সাহেবের গলা।

আংকেল আমি টুটুল।

কী ব্যাপার টুটুল, এত রাতে? বদ্ধ দরজার ওপাশ থেকে হামিদ সাহেবের নিদ্রাজড়িত উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

আংকেল, মা তো বাসায় আসল না!

তোমার মা আসে নাই এখনো! কই গেছে?

একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল। সেইটাতে গেছে জানতাম।

বিয়ের দাওয়াত থেকে এত রাতে আসবে না কেন? তুমি বাসায়। ফোন তো করবে।

দরজা খুলে গেল। লুঙ্গিপরা হামিদ সাহেব বেরিয়ে এলেন।

আংকেল...টুটুলের গলা কান্নার গমকে ভেঙে আসছে।

তুমি চিন্তা কোরো না, এসে যাবে।

এখন আমি কী করব আংকেল?

তুমি? তুমি আর কী করবে? এত রাতে তো খোঁজখবরও করা যাবে না।

আংকেল...মা আর আসবে না?

আচ্ছা তুমি বাসায় যাও। ঘুম দাও। আর শোনো, তোমার মামা-খালা সবার বাসায় ফোন করো।

আংকেল, পুলিশকে জানানো দরকার না?

পুলিশ? হ্যাঁ, তা জানানো যায়। আচ্ছা বাদ দাও। তুমি আগে মামা-খালাদের বাসায় ফোন করো। কোথাও গিয়ে আটকে গেল কি না। আচ্ছা শোনো, ইদানীং কি তোমার মার সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের বেশি খাতির হয়েছে?

টুটুল প্রশ্নটা বোঝে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তোমাদের বাসায় কি তোমার মায়ের কোনো বন্ধু আসে?

না তো আংকেল!

তোমার মা কি তোমার কোনো আংকেলের সাথে অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলে?

না তো আংকেল!

আমার মনে হয় পুলিশকে আজকে রাতে না জানানো ভালো। কাল সকালে যদি তোমার মা এসে হাজির হন, তখন তিনি রাগ করবেন, কেন পুলিশকে জানালে! তুমি ঘুমাও। আমি সব দেখছি।

টুটুল বাসায় আসে। আমার বোনদের বাসায় ফোন করে। তিন বোন ঢাকায় আছে আমার। না, কোনো ভাই নাই।

এত রাতে ফোন করে করে সে খালাদের জানিয়ে দিচ্ছে তার মার হারিয়ে যাওয়ার খবর।

সামিনা, সাবিনার বাসায় ফোন ধরে। সাহানার বাসায় রিং হয়, কিন্তু কেউ ফোন

ধরে না। আমি আসিনি শুনে সবাই উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু এত রাতে কে-বা কী করতে পারে।

টুটুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি তার শিয়রে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি। আহা আমার ছেলেটা! আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছে। কারণ হাসপাতালে আমার চিকিৎসা শুরু হয়নি। ঠিক সময়ে শুরু হলে আমি হয়তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু যেভাবে অযত্নে ফেলে রেখেছে আমার শরীরটা, তাতে মনে হয় না আর বাঁচব। এই যে শরীর ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর কখনো তাতে ফিরে যাওয়া হবেই না বোধ হচ্ছে।

মেজো দুলাভাই এসেছেন হাসপাতালে। পরের দিন দুপুর ১২টায়। আমার অ্যাকসিডেন্টের ১৪ ঘণ্টা পর।

আমি তখনো মেঝেতে। তবে ওয়ার্ড বদল হয়েছে। যদিও শরীরের নিচে একটা কম্বল জুটেছে। মাথার কাছে আমার অসুখের বৃত্তান্তসমেত কাগজটা ঠাঁই পেয়েছে একটা ধাতব ফাইলে।

রোগীর নাম : অজ্ঞাত

বয়স : অজ্ঞাত

লিঙ্গ : মহিলা

রোগের নাম : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ

মেজো দুলাভাই আমাকে দেখে শিউরে উঠেছেন। তিনি একটা এনজিওতে চাকরি করেন। ঠাণ্ডামাথার মানুষ। এই তো হাসনা। তিনি ছুটে যাচ্ছেন ডাক্তারদের কক্ষের দিকে। আপনারা জানেন, সে কে? সে অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি। আপনারা তাকে ফ্লোরে ফেলে রেখেছেন?

ডাক্তার নির্লিপ্ত। বেড না থাকলে কী করব? অন্য পেশেন্টকে বেড থেকে নামায়া ওনারে তুলব?

আমার চিকিৎসা শুরু করা দরকার। মেজো দুলাভাই নানা তৎপরতা করছেন। একটা হলো: আমার শরীরটা ধরে নিয়ে যাওয়া হবে একটা বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। আমার সিটি স্ক্যান করা হবে।

আমার ছেলেটা মেজো আপার সঙ্গে আমাকে দেখতে এসেছে। আমার শরীরের পাশে বসে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাচ্ছে। ওর চোখের নিচে কালি পড়েছে। আজকে বোধহয় স্কুলে যাওয়া হয়নি।

আমাকে একটা বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে আমার শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কোনোরকমে। পানির মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে মেজো দুলাভাইয়ের।

আমি আমার বোনদের বাসা থেকে ঘুরে এসেছি। বোনেরা, দুলাভাইরা খুবই চিন্তিত। টুটুলের দায়িত্ব কে নেবে? এ নিয়ে তারা শিগগিরই মিটিং বসাবে। কারণ টুটুলের দায়িত্ব যে নেবে, সে পাবে অনেক টাকারও দায়িত্ব।

মেজো বোনের বাসায় টুটুলের ছোট চাচা রওশন এসে হাজির। লোকটা মাদকাসক্ত। টুটুল এখন এই বাসাতেই থাকে।

রওশন মেজো দুলাভাইকে বোঝাচ্ছে: টুটুল আমাদের বংশের ছেলে। ওকে আমরা নিয়া যাব।

যত দিন ওর মা বাঁইচা ছিল তত দিন এক কথা। এখন তো মা নাই।

মেজো দুলাভাই বললেন, টুটুলের মা এখনো বেঁচে আছে। ওর চিকিৎসা চলছে।

আমার অন্য বোনেরাও মেজো আপা দুলাভাইকে ঈর্ষা করছে। টুটুলকে নিজেদের বাসায় নেওয়া গেল না কেন, এ নিয়ে তারা আফসোস করছে।

টুটুল চুপ করে বসে আছে মেজো আপার গেস্টরুমের বিছানায় পা ঝুলিয়ে।

আমার অবস্থা বেশি সুবিধার নয়। ভেন্টিলেটর খুলে নিলে আমি মরেই যাব। আমি টুটুলের মাথায় হাত বোলাই। টুটুল, তোর জন্যে এই পৃথিবীতে আমি কিছুই রেখে যেতে পারলাম না বাবা। তুই বাবা এই দুনিয়ায় কেমনে দিন কাটাবি।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

গাধার কৌতুক

ঈশপের গল্পগুলোর সবই যে ঈশপের রচনা তা নাও হতে পারে। নিচের গল্পগুলো ঈশপের গল্প হিসাবেই প্রচলিত। সবগুলোই গাধা বিষয়ে। এটি আমার একটা প্রিয় বিষয়। হাজার হলেও আমি সক্রেটিসের পরামর্শ তো ফেলতে পারি না। তিনি বলেছিলেন, নো দাইসেল্ফ। একদেশে ছিল একটা গাধা। সে ছিল একটা কবিরাজের বাড়িতে। কবিরাজ তাকে খেতে দিত খুব কম! গাধা তাই প্রার্থনা করল দেবতার কাছে। বলল, এই মালিককে আমার পছন্দ না। অন্য কোনো মালিকের অধীনে আমাকে পাঠাও। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। কবিরাজ তাকে বিক্রি করে দিল একজন ধোপার কাছে। ধোপাও তাকে খাবার কম দেয় আর তার পিঠে তুলে দেয় বড় বড় বোঝা।

সে আবার প্রার্থনা করল দেবতার কাছে, আমাকে অন্য কোনো মালিকের কাছে পাঠাও। ধোপা গাধাটাকে বিক্রি করে দিল এক ইঁটের ভাটার মালিকের কাছে। এই ভাটামালিক তার পিঠে বড় বড় ইঁটের বোঝা চাপাতে লাগল। অগত্যা গাধা প্রার্থনায় বসল, বলল, এইবারই শেষ। আমাকে আরেকবার মালিক বদলানোর সুযোগ দাও। এইবার তাকে কিনে নিল একজন মুচি।

গাধা দেখল, সর্বনাশ, এতো মৃত পশুর চামড়া ছিলে নেয়।

সে বলল, আমাকে সেই কবিরাজের কাছেই আবার পাঠাও। এতো দেখছি আমার চামড়া ছাড়াবে।

এই গল্পের হিতোপদেশটা আমি আর ভেঙে বলতে চাই না।

এবার আরেক গাধার গল্প। এই গাধাটিকে বিক্রি করা হবে। হাটে তোলা হয়েছে। সম্ভাব্য ক্রেতা বলল, আমি গাধাটিকে কিনতে চাই। তবে কেনার আগে একটু পরখ করে নেব। তাই হলো। অন টেস্ট গাধাটিকে ক্রেতা নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। রাখল তার আস্তাবলে। আস্তাবলে আরো কিছু গাধা ছিল। এই গাধাটিকে সে ছেড়ে দিল আস্তাবলে। পরের দিন দেখা গেল, গাধাটি পুরোনো গাধাগুলোর মধ্যে

যেটা কিনা সবচেয়ে অলস তার পাশে শুয়ে আছে।

ক্রেতা গাধাটিকে তার মালিকের কাছে ফেরৎ দিয়ে বলল, না আমি একে নিব না। আমি চিনেছি এর পাশের গাধাটিকে দেখে। ঠিক যেমন মানুষ চেনা যায় তার সঙ্গীসাথীদের দেখে। এই গাধা একটা আলসের ধাড়ি।

আরেকটা গল্প। এক গাধা একদিন একটা সিংহের চামড়া কুড়িয়ে পেল। শিকারিরা এটা ফেলে রেখে গিয়েছিল। গাধাটা সেই সিংহের চামড়া পরে গ্রামে ঢুকে পড়ল। গ্রামবাসী তাকে সিংহ মনে করে ভয়ে পালিয়ে গেল। গাধা তো মহাখুশি বাহবা, তাকেও লোকে ভয় পায়। তখন খুশিতে সে চিৎকার করে উঠল। গাধার ডাক শুনে সবাই বুঝল এতো সিংহ নয়। এতো গাধা। তার মালিক মহা চটে গেলেন। তাকে পিটিয়ে ঝাল মেটালেন।

তাই ঈশপ বলেন, ছদ্মবেশে নিজের প্রকৃত চেহারা ঢেকে রাখা যায় না। আর এই ক্ষুদ্র লেখক বলেন, যারা আদপে গাধা, কিন্তু পরনের পোশাকটা যাদের সিংহের, তারা মুখ না খুললেই পারেন। মুখ খুললেই তো দেখা যাচ্ছে বিপদ হচ্ছে।

এই গল্পটা গাধার নাকি শেয়ালের ঠিক বুঝছি না। এক গাধা আর এক শেয়ালের খুব বন্ধুত্ব হলো। তারা বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে আর গল্প করছে। তখন তাদের সামনে এল এক সিংহ। শেয়াল বলল, মহারাজ, আপনি যদি আমাকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি গাধাটাকে আপনার জন্যে ভেট হিসাবে উপহার দিব।

সিংহ রাজি হলো। শেয়াল গাধাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে বলল, একটা গর্তে লাফিয়ে পড়তে। বোকা গাধা গর্তে লাফ দিল। আর সে এই গর্ত থেকে উঠতে পারবে না। শেয়াল গেল সিংহের কাছে। বলল, গাধাটাকে গর্তে ফেলেছি। এবার আপনি তাকে নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

সিংহ বলল, গাধাটা তো আর উঠতে পারবে না। ওকে পরে খেলেও চলবে। আপাতত তোকেই

সিংহ তার মধ্যাহ্নভোজ সারল শেয়ালের মাংসে।

এই গল্পের উপদেশ হলো, সিংহ এক এক করে সব পশুকেই খাবে। তার আগে এক পশুকে দিয়ে আরেক পশুকে ঘায়েল করিয়ে নেবে। যেমনটা বলেন মহামতি ঈশপ।

এইবার শেষ গল্প। এটি অবশ্য ঈশপের গল্প নয়।

এক ধোপার গাধা। তাকে ধোপা খেতে দেয় না। কিন্তু কাজ করিয়ে নেয় অতিরিক্ত! তবু গাধাটা এই বাড়ি ছেড়ে যায় না। আরেকটা গাধা তাকে একদিন বলল, এই বাড়ি ছেড়ে তুমি পালাও না কেন। অন্য যে কেউ তোমাকে ঘরে তুলে নেবে আর

অনেক ভালো খাওয়া দেবে, আরাম দেবে।

গাধাটা তখন বলল, একদিন আমি এই বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে গেছি। শুনি ধোপা তার বউকে বলছে, আজকেও তরকারিতে লবণ বেশি দিয়েছিস। আরেকদিন যদি লবণ বেশি দিস, তাহলে তোকে ওই গাধাটার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব।

আমি আশায় আশায় আছি। আর একদিন কি বউটা তরকারিতে লবণ বেশি দেবে না! প্রিয় পাঠক, আমরাও আশায় আশায় আছি। কী আর করব! সংসার সাগরে দুঃখতরঙ্গের মেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা!

আসুন, বাংলা ইতিহাস-ঐতিহ্য খুঁজি আঁস্তাকুড়ে!

আমরা সফল। আমরা সার্থক। আমরা ধন্য। আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সফলতার সঙ্গে আঁস্তাকুড়ে আর বর্জ্য-ভাগাড়ে নামাতে সমর্থ হয়েছি।

কাজটা করতে আমাদের অবশ্য নানা বেগ পেতে হয়েছে। আমরা তাতে দমে যাইনি। কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে! আমরা ক্ষান্ত হইনি। উদ্যম বিহনে কি কেউ ফরাসিদেশে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করে।

আমরা আমাদের মূল্যবান প্রত্নসম্পদ ফরাসিদেশে পাঠানোর জন্য উন্মুখ হয়েছি। ঘোষণা করেছি, তাতে আমাদের ভাবমূর্তি বাড়বে। আমরা সবচেয়ে বেশি কাতর দেশের ভাবমূতি নিয়ে।

তো চুক্তি করতে গিয়ে যে আইনকানুন– সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল ছিল না। ভাবমূর্তি বলে কথা! যেন তেন করে চুক্তি করেছি, পরিবহনের সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিইনি, বীমা করেছি হাস্যকর রকম কম টাকায়। কারণ টাকা বড় কথা নয়, বড় কথা দেশের ভাবমূর্তি (বিদেশ সফর? সে তো নিমিত্ত মাত্র!)।

এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ করেছেন। আমরা পাত্তা দিইনি। হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই আদেশকেই স্থগিত করে দিয়েছি। আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম থেকে তো বিচ্যুত হতে পারি না। তাতে যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

তারপর? তারপর আমরা আমাদের সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনন্য প্রত্ননিদর্শনগুলো রাতের অন্ধকারে এয়ারপোর্টে নিয়েছি। এত যত্নে, এত নিরাপত্তাঘেরে সেসব রেখেছি যে সুইপার- ড্রাইভাররা বাক্স কুলে সেসব নিয়ে সটকে পড়েছে।

পাল আমলের বিষ্ণুমূর্তি– হাজার বছরের পুরোনো– চোরাকারবারিদের হাত দিয়ে সেই মূর্তি ভেঙে আমরা টুকরো টুকরো করে ছেড়েছি, কারণ মূর্তির দিকে

আমাদের নজর নেই, আমাদের নজর ভাবমূর্তির দিকে।

তারপর আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আমরা ফেলে দিয়েছি ডাস্টবিনে,সেখান থেকে বর্জ্য-ভাগাড়ে।

যাও প্রিয় র‍্যাব বাহিনী, ইতিহাস উদ্ধার করো আঁস্তাকুড় ঘেঁটে! মাছের কানকো, ফলের খোসা, মরা বিড়াল, পচে ফুলে ওঠা পূতিগন্ধময় ময়লা-আবর্জনা ঘেঁটে ঘেঁটে এখন মূর্তির টুকরো খোঁজা হচ্ছে। এরই মধ্যে বাতিল হয়ে গেছে প্রদর্শনী, ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে আগের দফায় ফ্রান্সে চলে যাওয়া বাকি নিদর্শনগুলো। ফরাসিরা গোস্বা করছে! সব মিলিয়ে ভাবমূর্তিটা কোথায় গেল! বেচারা আইয়ুব কাদরী,ভদ্রলোক মানুষ, আত্মমর্যাদা আছে বলে পদত্যাগ করলেন। তাতেই প্রমাণিত হলো, হাকিম নড়ে, তবু আমরা নড়ি না।

দেখুন, আমরা কত পারি! আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আঁস্তাকুড়ে নামিয়েছি, মূর্তি টুকরো টুকরো করে ভাবমূর্তি রক্ষা করেছি। প্রমাণ করেছি, আমরা কত দক্ষ! দক্ষতার সঙ্গে আমরা মূর্তি চুরি করতে পারি, ইতিহাসকে নিয়ে যেতে পারি তার ইতিহাস-নির্ধারিত জায়গায় তথা ভাগাড়ে, আবার আমরা কয়েক ঘণ্টাতেই ঘিরে ফেলতে পারি চোরাকারবারিদের, গ্রেপ্তারও করতে পারি তাদের, আবার আঁস্তাকুড় ঘেঁটে ইতিহাসকে উদ্ধারও করতে পারি।

আপনারা আমাদের নামে জয়ধ্বনি করুন, প্রিয় দেশবাসী।

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো: মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জেলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারী চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে উপসম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশনের জন্যে চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা– নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়। বই বেরিয়েছে ৭০টির মতো। তার রচিত টেলিভিশন কাহিনীচিত্রের মধ্যে *নাল পিরান*, *প্রত্যাবর্তন*, *করিমন বেওয়া*, *প্রতি চুনিয়া*, *ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন*, মেগা সিরিয়াল *৫১বর্তী* প্রভৃতি দর্শকনন্দিত হয়েছে। তার রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র *ব্যাচলর* জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ টিভি নাট্যকার হিসেবে বাচসাস পুরস্কার, টেনাশিনাস পদক, ট্রাব এওয়ার্ড, কালচারাল রিপোর্টার্স এওয়ার্ডসহ পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার। সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন: আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।